হিন্দুধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা হাতে নারী মুক্তিযোদ্ধা

বীরপ্রতীক ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম

বীরপ্রতীক তারামন বিবি

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত ৪০০ শয্যার বাংলাদেশ হাসপাতালটি ভারতের আগরতলায় বিশ্রামগঞ্জে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ হাসপাতালটি বাঁশ দিয়ে তৈরি ছিল। ২ নং সেক্টরের অধীনে ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম এ হাসপাতালে কমান্ডিং অফিসার (সিও) ছিলেন। তিনি নিয়মিত ঝুঁকি নিয়ে আগরতলা থেকে ঔষধ আর দরকারি সরঞ্জামাদি আনার কাজ করতেন। গুরুতর আহত মুক্তিযোদ্ধা অথবা অনাহার আর রোগে ভোগা শরণার্থীদের অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে মুমূর্ষু সময়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে গেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধকালীন বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগমকে ‘বীরপ্রতীক’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

কুড়িগ্রামের শংকর মাধবপুরে ১১ নম্বর সেক্টরে কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করা, তাঁদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, পাকিস্তানি বাহিনীর খবর সংগ্রহ করা এবং সম্মুখযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধে শুধু সম্মুখ যুদ্ধই নয়, নানা কৌশলে শত্রুপক্ষের তৎপরতা এবং অবস্থান জানতে গুপ্তচর সেজে সোজা চলে গিয়েছেন পাক-বাহিনীর শিবিরে। দুর্ধর্ষ সেই কিশোরীর অসীম সাহসিকতার জন্য ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার তারামন বিবিকে ‘বীরপ্রতীক’ খেতাব প্রদান করেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস

ড. তাপস কুমার বিশ্বাস

ড. ময়না তালুকদার

সুবর্ণা সরকার

ড. শিশির মল্লিক

বিউটি সাহা

ড. প্রবীর চন্দ্র রায়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০২২
পুনর্মুদ্রণ: , ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ
পঙ্কজ বর্মন

প্রচ্ছদ
মঞ্জুর আহমদ

গ্রাফিক্স
শিশির ঘোষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যে কোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনো আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সঙ্গে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। উল্লেখ্য যে ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তী কালীন ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে লেখক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত করা হয়েছে। আশা করা যায় পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকটির মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে ধরা পড়লে এবং এর মানউন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

প্রিয় শিক্ষার্থী

সপ্তম শ্রেণির এই বইয়ে তোমাকে স্বাগত।

এই বইটি তোমাকে নতুন নতুন কাজের মধ্য দিয়ে কিছু নতুন অভিজ্ঞতা দেবে। তোমরা নিজেদের জীবনে কীভাবে এই অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগাবে, ঈশ্বরের অপার মহিমা জেনে মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করবে সেই বিষয়ে অনেক কথা এই বইয়ে লেখা আছে।

ফিল্ডট্রিপ, ছবি আঁকা, নাটিকা, গান, কবিতা এরকম অনেক আনন্দময় ঘটনা দিয়ে সপ্তম শ্রেণির হিন্দুধর্মের নানাবিধ বিষয় তুমি জানতে পারবে। এসব বিষয়ের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কাজ তুমি কীভাবে করবে তা-ই জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে এ বইটির মাধ্যমে।

বিভিন্ন শিরোনামে এ বইয়ে হিন্দুধর্মের কিছু মূল কথা তোমাদের জানানো হয়েছে। বইটির মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি আছে, দেবদেবী এবং অবতারগণের জীবনী এবং খেলার ছলে কিছু কাজ করার কথা বলা হয়েছে।

এ বইয়ের বিষয়গুলো যেমন ধর্মসম্মত তেমনি আনন্দদায়ক। এ বিষয়গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লেই হিন্দুধর্মের মূল বক্তব্য তুমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে। আর তোমার মনে এ সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নে এলে সে প্রশ্নগুলো তোমার শিক্ষক, বাবা-মা/অভিভাবক বা বন্ধুকে করতে পার।

তোমার জন্য অনেক ভালোবাসা এবং শুভকামনা। চলো আমরা আনন্দের মধ্য দিয়ে, কাজের মধ্য দিয়ে, অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের সপ্তম শ্রেণির জন্য নিধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করি।

হিন্দুধর্ম শিক্ষা তোমার জন্য অনেক আনন্দের হোক, এই কামনা।

সূচিপত্র

হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত ধারণা	১-১৫
ঈশ্বরের স্বরূপ: নিরাকার ও সাকার	১৬-২৮
মন্ত্র, শ্লোক ও প্রার্থনামূলক কবিতা	২৯-৩৪
পূজা-পার্বণ, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র	৩৫-৫৬
যোগাসন	৫৭-৬২
নৈতিক মূল্যবোধ	৬৩-৭১
আদর্শ জীবনচরিত	৭২-৮৫
সম্প্রীতি	৮৬-৯৫

হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত ধারণা

প্রীতি এবং উদিতা ঘনিষ্ঠ দুই বান্ধবী। বিকেল বেলা উদিতা এলো প্রীতির বাড়িতে। উদিতা প্রীতির ঠাকুমা এবং মাকে প্রণাম করে জানতে চাইল, প্রীতি কোথায়? প্রীতির মা বললেন, দুপুর থেকেই ও একা ঘরে বসে আছে। কী সব বিষয় নিয়ে ভাবছে। প্রীতির ঘরে এসে উদিতা দেখল সত্যিই তাই। প্রীতি কী নিয়ে যেন চিন্তা করছে।

উদিতা : প্রীতি, কী ব্যাপার, কী নিয়ে ভাবছ?

প্রীতি : না, তেমন কিছু না। কিছুদিন থেকেই বেশ কিছু চিন্তা আসছে মাথায়। কিন্তু কোনো উত্তর পাচ্ছি না। কোথায় পাব তা–ই ভাবছি।

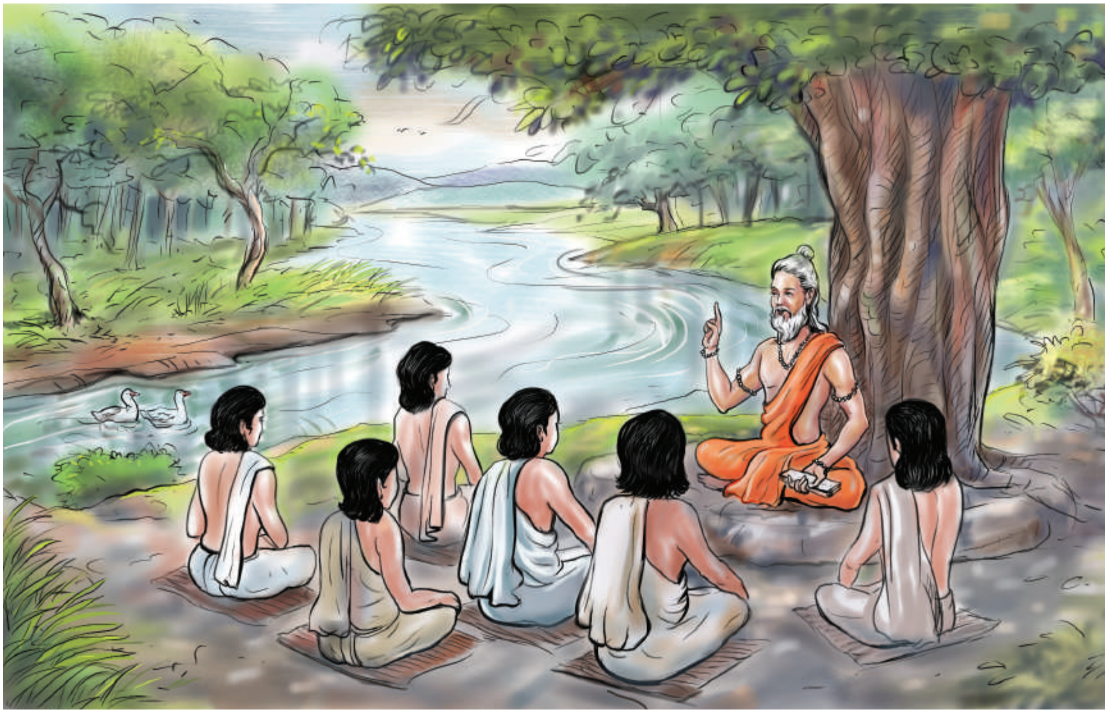

উদিতা : কী চিন্তা আমাকে বলো। তবে তার আগে চলো, মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে আসি। দেখবে মন ভালো হয়ে গেছে। মনে কোনো দুশ্চিন্তা এলে ভগবানকে ডাকতে হয়।

প্রীতি : তা না হয় গেলাম। কিন্তু যে ভাবনাটা মনে আসছে তা হলো, আমরা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা এবং আরাধনা করি। কিন্তু এ সকল পূজা বা আরাধনার নিয়মসমূহ, আমাদের ধর্মের আরও নানা বিষয়ে কোনো কিছু জানতে হলে, কোথা থেকে এসব ঠিকভাবে জানতে পারব?

উদিতা : আমিও বিষয়টি ঠিকভাবে তোমাকে বলতে পারব না। আচ্ছা এক কাজ করি চলো, আগামীকালের ধর্মের ক্লাসে কেশব স্যারকে জিজ্ঞেস করি। তবে এ সকল বিষয় আমরা হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পুস্তক থেকেও জানতে পারি।

উপরের গল্পে উদিতা ও প্রীতির ন্যায় অনেকেই হয়তো আমাদের হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চায়। কিন্তু কোথা থেকে ঠিকভাবে বিষয়গুলো জানতে পারবে তা হয়তো জানে না। অনেকের বাড়িতে বা গ্রামের মন্দিরে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় গ্রন্থ থাকে, আবার অনেকের হয়তো নেই। তাই ধর্মবিষয়ক কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমরা সহজেই তার ঠিক উত্তরটি খুঁজে পাই না। বিশেষ করে বিভিন্ন পূজা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পার্বণ ইত্যাদি ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে পালন, মন্ত্র পাঠ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজন পড়ে। এবার আমরা হিন্দুধর্মের গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ সম্পর্কে জানব। তবে চলো তার আগে একটা কাজ করি–

- শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক কয়েকটি দলে ভাগ হই। এবার প্রতি দলের সদস্যরা মিলে সহজে পাওয়া যায় এমন কিছু হিন্দুধর্মীয় বইয়ের তালিকা করি এবং সাধ্যমতো কয়েকটি বই সংগ্রহের চেষ্টা করি। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারি। বিদ্যালয় বা নিকটস্থ লাইব্রেরিতেও এ ধরনের ধর্মীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়। পাশের কোনো একটি লাইব্রেরিতে গিয়ে আমরা খোঁজ নিতে পারি। সেখানে খুঁজে দেখি হিন্দুধর্মের কী কী গ্রন্থ পাওয়া যায়। লাইব্রেরিতে পাওয়া না গেলে মন্দিরের পুরোহিত বা বড়োদের সাহায্য নিতে পারি। এমনকি ইন্টারনেট বা অন্যান্য মাধ্যম থেকেও ডাউনলোড বা সংগ্রহ করে আমরা পড়তে পারি।

- লাইব্রেরিতে বা বিভিন্নভাবে যে সকল ধর্মীয় পুস্তকা দেখলাম এবং পড়লাম সেই অভিজ্ঞতাটি নিচে লিখি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

■ আমরা যে সকল ধর্মীয় পুস্তক দেখলাম এবং পড়লাম সে সকল পুস্তকের তালিকা নিচে লিখি।

১.

২.

৩.

৪.

৫.

আমরা লাইব্রেরিতে বা সংগৃহীত ধর্মগ্রন্থসমূহে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছুই জানলাম। গ্রন্থগুলো সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকভাবে আমরা জানব। তবে প্রথমেই আমরা জানব বিভিন্ন গ্রন্থে আমাদের ধর্মের উৎস ও বিকাশ সম্পর্কে। অর্থাৎ কীভাবে হিন্দুধর্ম কথাটির উদ্ভব হলো।

হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত ধারণা

পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম। 'হিন্দু' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে অনেক মত রয়েছে। এখানে বহুল প্রচলিত মতটির উল্লেখ করা হলো। এক সময়ে আর্যরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাস করত। প্রাচীন পারস্যবাসীরা 'স'কে 'হ' উচ্চারণ করত। তাদের উচ্চারণে সিন্ধু হয়ে গিয়েছিল হিন্দু। আর এর অববাহিকায় যারা বসবাস করত তাদেরও বলা হতো হিন্দু । এভাবে ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী 'হিন্দু' নামধারীরা হিন্দু জনগণ এবং হিন্দু সম্প্রদায় নামে পরিচিত হলো। এদের আচরিত ধর্মও হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হলো। পরে এই হিন্দু জনগণ যে স্থানে গিয়েছে সে স্থান পরিচিত হলো হিন্দুস্থান নামে। হিন্দুধর্মের আরেক নাম সনাতন ধর্ম। সনাতন শব্দটি অনেক প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। সনাতন শব্দের অর্থ চিরন্তন বা শাশ্বত। অর্থাৎ যা পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে তা হলো সনাতন। চিরকালের বক্তব্য ও দর্শন আছে এই ধর্মে। সনাতন ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থে এ ধর্মের বক্তব্য ও দর্শন বর্ণিত আছে।

হিন্দুধর্মের সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ হলো বেদ। এছাড়া আরও অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। যেমন—উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পুরাণ, শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রভৃতি। সকল ধর্মগ্রন্থেই ঈশ্বরের কথা আছে। তবে এখানে কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো।

বেদ

আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ শব্দের অর্থ হলো জ্ঞান। বৈদিক যুগে মানুষের চিন্তাভাবনা, দেবদেবী, ঈশ্বরের ধারণা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে বেদে। প্রাচীনকালে জ্ঞানী ব্যক্তিদের বলা হতো ঋষি। এই ঋষিরা ধ্যান করতেন। সাধনা করতেন। এই ধ্যান ও সাধনা থেকে তাঁরা অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। এই জ্ঞানের কথা আছে বেদে। বেদে অনেক দেবদেবীর কথা আছে। এঁদের বলা হয় বৈদিক দেবতা। দেবতাদের মধ্যে আছেন অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, উষা, সরস্বতী প্রভৃতি। শ্লোক কাকে বলে তা আমরা জানি। ছন্দোবদ্ধ পদাবলি হলো শ্লোক। বেদে এই শ্লোক 'মন্ত্র' নামে পরিচিত। বৈদিক মন্ত্রের রচয়িতাকে বলা হয় ঋষি। তবে ঋষিদের রচয়িতা না বলে বলা হয়েছে দ্রষ্টা; মন্ত্রদ্রষ্টা। ঋষিরা ধ্যান করেছেন। এই ধ্যানের মধ্য দিয়ে তাঁরা কোনো সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। এই উপলব্ধ সত্য মন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত। মন্ত্রের মধ্য দিয়ে ভিন্ন দেবদেবীর কথা জানা যায়। এই দেবদেবী মূলত প্রকৃতির বিভিন্ন সত্তা। প্রকৃতির নানা সত্তার ওপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৈদিক দেবতারা তাই প্রাকৃতিক দেবতা। এভাবে অগ্নি, সূর্য, উষা, ইন্দ্র, বায়ু, চন্দ্র, বরুণ, অরণ্যানী, সরস্বতী প্রমুখ দেবতা প্রকৃতি বা জগতেরই অংশ। ঋষিরা প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা শক্তি অনুভব করেছেন। বৈদিক ধর্মগ্রন্থ বা বৈদিক সাহিত্য খুবই বিশাল। অতি সংক্ষেপে এখানে বেদ সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া হবে।

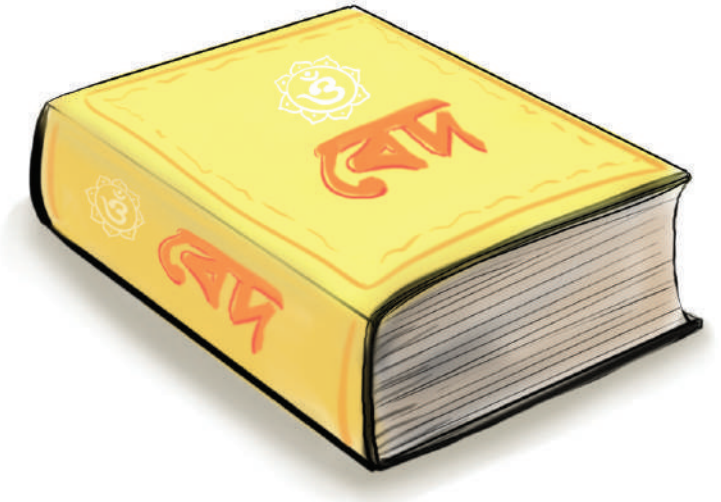

বেদ

বেদ প্রথমে অবিভক্ত ছিল। পরবর্তীকালে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদকে চারভাগে বিভক্ত করেন। যথা—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। বেদকে বিভক্ত করেছেন বলে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বেদব্যাস বলা হয়ে থাকে। চার বেদের কয়েকটি ভাগকে সংহিতা বলে।

ঋগ্বেদ সংহিতা : ঋক্ মানে মন্ত্র। ঋগ্বেদে ঈশ্বরের প্রাকৃতিক সত্তার শক্তিরূপে অনেক দেব-দেবীর গুণকীর্তন বা প্রশংসা ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র রয়েছে। মন্ত্রগুলো পদ্যে বা ছন্দে রচিত এক ধরনের কবিতা। মূলত দেব-দেবীর গুণকীর্তন বা প্রশংসামূলক মন্ত্রের সংগ্রহই হলো ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদের ঋষিদের মধ্যে বিশ্বামিত্র, মধুছন্দা, বামদেব, বসিষ্ঠ, বাক্, সরস্বতী প্রমুখ বিখ্যাত। ঋগ্বেদ বেদসমূহের মধ্যে প্রথম গ্রন্থ। ঋগ্বেদ বিশ্বসাহিত্যেও প্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। ঋগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভাজিত। প্রত্যেক মণ্ডলে আছে অনেক সূক্ত। সূক্ত হলো মন্ত্রের সমষ্টি। যে সূক্ত যাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে তিনি সেই সূক্তের দেবতা। ঋগ্বেদের মন্ত্র পদ্যে রচিত।

সামবেদ সংহিতা : সাম মানে গান। যে মন্ত্র সুর দিয়ে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তাকেই বলা হয় সাম। যে বেদে এ ধরনের মন্ত্র স্থান পেয়েছে তা সামবেদ। সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্র ঋগ্বেদ সংহিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

যজুর্বেদ সংহিতা : ঋক্ ও সাম ব্যতীত অবশিষ্ট বেদমন্ত্রসমূহই যজুঃ নামে পরিচিত। যজুঃ মানে যজ্ঞ। যজ্ঞের অধিকাংশ নিয়ম এবং কার্যপ্রণালি যজুর্বেদে বর্ণিত হয়েছে। যজ্ঞের সঙ্গে যে বেদের মন্ত্রের গভীর সম্পর্ক তা-ই যজুর্বেদ। যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ গদ্য ও পদ্যে রচিত। এটি কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ নামে দুই ভাগে বিভক্ত।

অথর্ববেদ সংহিতা : বেদের চতুর্থ ভাগ হচ্ছে অথর্ববেদ। অথর্ববেদকে প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎস বলা যায়। এখানে নানা প্রকার রোগব্যাধি এবং সেগুলোর প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। রোগ নিরাময়ের উপায়স্বরূপ নানাপ্রকার বৃক্ষ, লতা-পাতা, গুল্ম প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ নামক যে চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে তারও আদি উৎস এই অথর্ববেদ। এছাড়া অস্থিবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, শল্যবিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে এ বেদে উল্লেখ রয়েছে।

বেদ সম্পর্কে আমরা যা জানলাম তার ওপর ভিত্তি করে নিচের ঘরগুলো পূরণ করি। উদাহরণ হিসেবে একটি করে দেওয়া আছে।

বেদ

ঋগ্বেদ			
সংহিতা	সংহিতা	সংহিতা	সংহিতা
ঋক্ মানে মন্ত্র			
ঋগ্বেদে ঈশ্বরের প্রাকৃতিক সত্তার শক্তিরূপে অনেক দেবদেবীর গুণকীর্তন বা প্রশংসা ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র রয়েছে।			

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক

সংহিতা ভাগের পরবর্তী ভাগ হলো ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক। ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ ভাগে আছে যাগযজ্ঞের কথা। আরণ্যক ভাগে আছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানা জ্ঞানমূলক কথা। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে নানা কথা।

উপনিষদ

বেদ সংহিতা পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের শেষ অংশ হলো উপনিষদ। মুনি-ঋষিদের ধ্যানলব্ধ অতি উচ্চ স্তরের চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে উপনিষদে। উপনিষদ বেদান্ত নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। বেদান্ত শব্দের অর্থ হলো বেদের অন্ত বা শেষভাগ। উপনিষদ শব্দের একটি অর্থ, গুরুর নিকটে বসে নিশ্চয়ের সঙ্গে যে জ্ঞান অর্জন করা হয় তাই উপনিষদ। উপনিষদের আলোচ্য বিষয় হলো ব্রহ্ম। এখানে নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। উপনিষদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে আছেন একমাত্র ব্রহ্ম। তিনি সত্য ও চৈতন্যময়। এছাড়া আর যা কিছু রয়েছে সবই অসত্য ও জড়। সুতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্তি হচ্ছে জীবের একমাত্র লক্ষ্য।

জীবের মূল সত্তা তার আত্মা। এই আত্মা হচ্ছে পরমাত্মা বা ব্রহ্মেরই অংশ। এই ব্রহ্ম নিরাকার। আত্মারূপে তিনি জীবের মধ্যে অবস্থান করে থাকেন। সুতরাং জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানই হলো উপনিষদের বিষয়বস্তু। এই আত্মার কোনো বিনাশ নেই। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। তবে বারোটি উপনিষদ প্রধান উপনিষদ হিসেবে স্বীকৃত। এ উপনিষদগুলো হলো—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক ও কৌষিতকী।

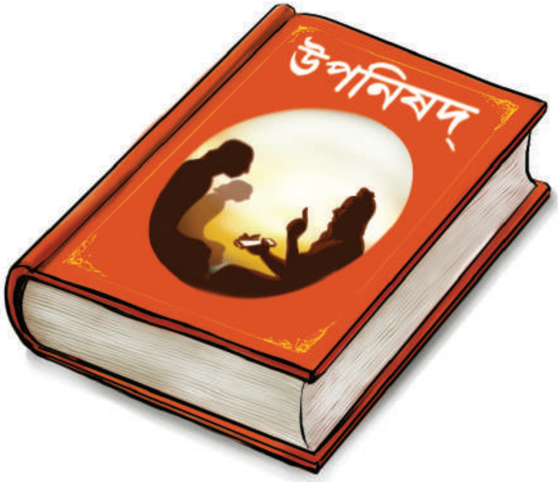

উপনিষদ

উপনিষদ এবং উপনিষদের ব্রহ্মকে অবলম্বন করে হিন্দু সমাজের একটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। এই ধারার নাম ব্রাহ্ম সমাজ। রাজা রামমোহন রায় এই সমাজের প্রথম প্রবক্তা। মূলত ঋগ্বেদ থেকে উপনিষদ পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক উত্তরণ দেখা যায়। এই উত্তরণ চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধির উত্তরণ। ঋগ্বেদে অনেক দেবদেবীর নাম পাওয়া যায়। এই দেবদেবীরা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত। পরে বোঝা গেল এক পরমেশ্বরের বিশ্বনিয়ন্তার অংশ এই দেবদেবী। দেবদেবীর কাছ থেকে কিছু প্রাপ্তির জন্য, তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল যজ্ঞ-কর্ম। আরও পরে মনে হলো, কর্ম নয়, জ্ঞান এবং কেবল জ্ঞানের মধ্য দিয়ে জানা যাবে পরমেশ্বরকে, বিশ্বনিয়ন্তাকে। এই জ্ঞানের ভাণ্ডার হলো উপনিষদ।

রামায়ণ

প্রাচীন ভারতীয় সূর্যবংশীয় রাজাদের কাহিনি নিয়ে রামায়ণ রচিত। এর রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকি। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি মহাকাব্য। অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের জীবন-কাহিনি এর মুখ্য বিষয়। এতে রামের কাহিনি থাকায় এর নাম হয়েছে রামায়ণ। বিষ্ণুর দশাবতারের একজন হচ্ছেন রাম। তাই হিন্দুধর্মে রামের কাহিনি। নির্ভর 'রামায়ণ' পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মর্যাদা পেয়ে থাকে। সমগ্র রামায়ণকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ভাগকে কাণ্ড বলা হয়। কাণ্ডগুলো হলো : (১) আদি (২) অযোধ্যা (৩) অরণ্য (৪) কিষ্কিন্ধ্যা (৫) সুন্দর (৬) যুদ্ধ এবং (৭) উত্তর কাণ্ড। রামায়ণে চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে।

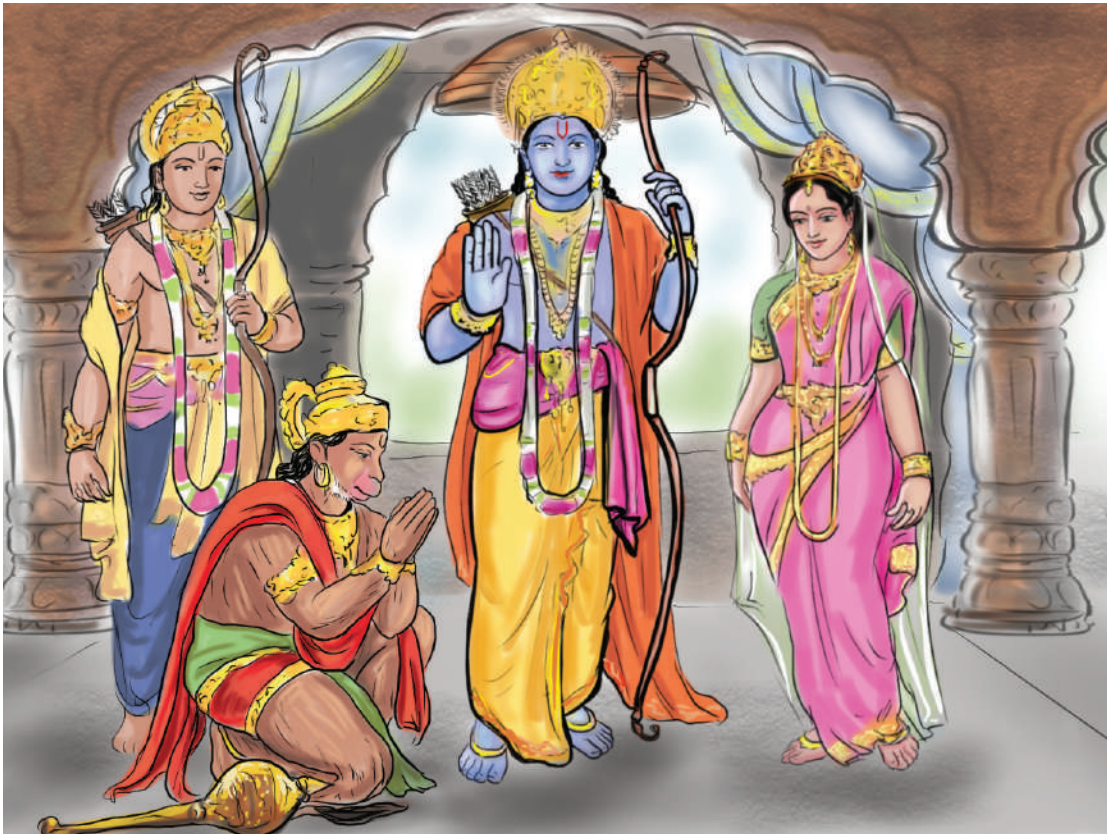

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও রামভক্ত হনুমান

অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রের জীবন-কাহিনি এ গ্রন্থের মুখ্য বিষয়। রাজা দশরথের তিন স্ত্রী—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার পুত্র রাম, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত, সুমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে যুবরাজ হিসেবে অভিষিক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু দাসী মন্থরার কুপরামর্শে প্ররোচিত হয়ে কৈকেয়ী দশরথের কাছে দুটি বর চান। কারণ দশরথ কৈকেয়ীকে পূর্বে বর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই রামের যুবরাজ হিসেবে অভিষেক হওয়ার কথা শুনে কৈকেয়ী দশরথের কাছে দুটি বর প্রার্থনা করেন। প্রথম বর হলো রামের চৌদ্দ বছর বনবাস আর দ্বিতীয়টি হলো ভরতের রাজ্যাভিষেক। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে চলে গেলেন। রামের শোকে দশরথ মারা গেলেন। বনবাস সময়ে লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে অপহরণ করেন। বানর-সেনাদের নিয়ে রাম লঙ্কা আক্রমণ করেন।

আক্রমণে রাবণ পরাজিত ও নিহত হন। রাম সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরে আনেন। সীতা দীর্ঘ দিন লঙ্কায় বন্দি ছিলেন। এ কারণে অনেক প্রজা সীতাকে মেনে নিতে পারছিল না। অবশেষে প্রজাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে দেন, সেখানে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে সীতা আশ্রয় গ্রহণ করেন। বনবাসে যাওয়ার সময় সীতা সন্তান-সম্ভবা ছিলেন। আশ্রমে যাওয়ার পর সীতার কুশ ও লব নামে দুটি যমজ সন্তানের জন্ম হয়। বারো বছর পর সীতা কুশ ও লবকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। কিন্তু সীতা মনের দুঃখে পাতাল প্রবেশ করেন। অনেক বছর পর রাম-লক্ষ্মণেরও মৃত্যু হয়।

এখানে রামায়ণের কাহিনিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে রামের অসংখ্য গুণ কার্যের কথা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে আমরা রামকে একজন পিতৃভক্ত সন্তান, প্রজাবৎসল রাজা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সফল বীর, ন্যায় এবং সত্যের প্রতীক হিসেবে দেখতে পাই। আমরা রামের এই গুণাবলি আমাদের জীবনে প্রতিফলন করার চেষ্টা করব।

- ইন্টারনেট বা অন্যান্য মাধ্যম থেকে রামায়ণ ধর্মগ্রন্থটি সংগ্রহ করো। ৬টি দলে বিভক্ত হয়ে রামায়ণের আদি কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ ধারাবাহিকভাবে দলে ভাগ হয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ো। এরপর দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অংশে রামের কয়েকটি গুণাবলি চিহ্নিত করো এবং ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখপূর্বক তা লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

মহাভারত

মহাভারত একটি বিশাল গ্রন্থ। এটি ভরতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। হিন্দুদের কাছে মহাভারত ধর্মীয়গ্রন্থ হিসেবে গৃহীত। এটি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছেন। তিনি ব্যাসদেব নামে পরিচিত। কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে রাজ্য নিয়ে বিবাদ ছিল। কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই বিবাদ শেষ হয়। পাণ্ডবদের জয়লাভ মহাভারতের মূল কাহিনি। এই কাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক উপকাহিনি। অনেক নীতিকথা, ধর্মের কথা বর্ণিত আছে মহাভারতের মোট আঠারোটি পর্বে।

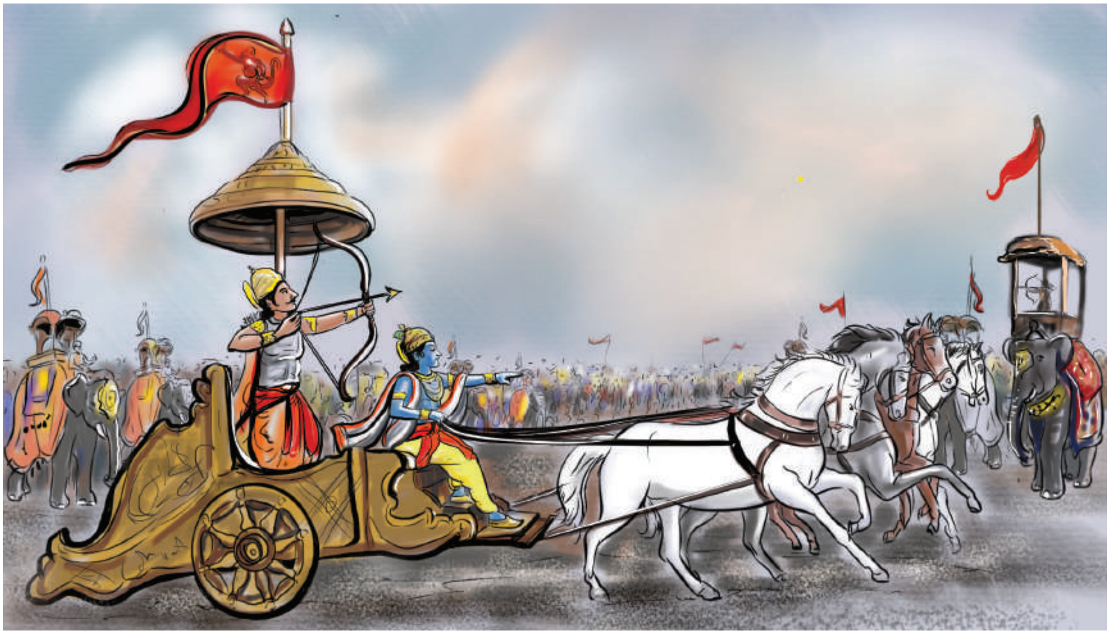

অর্জুন ও তার রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ

হস্তিনাপুর নামে একটি রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজা ছিলেন চন্দ্রবংশীয় শান্তনু। রাজা শান্তনুর তিন পুত্র ছিল—দেবব্রত, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। জ্যেষ্ঠ দেবব্রত বিয়ে করবেন না এবং সিংহাসনেও বসবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁর নাম হয় ভীষ্ম। চিত্রাঙ্গদের অকাল মৃত্যু হয়। তাই বিচিত্রবীর্য রাজা হন। তাঁর দুই পুত্র —ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, তাই পাণ্ডু রাজা হন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরের রাজা হওয়ার কথা। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তা মেনে নিতে পারেননি। আর তখন থেকেই শুরু হয় বিবাদ। এঁরা সকলেই কুরু রাজার বংশধর বিধায় কৌরব বলা হয়। কিন্তু পাণ্ডুর সন্তানরা পাণ্ডব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন অনেকবার পাণ্ডবদের মেরে ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা রক্ষা পেয়ে যান। পাণ্ডবদের রাজ্যছাড়া করার জন্য দুর্যোধনের মামা শকুনিকে নিয়ে তাঁদেরকে পাশা খেলায় আহ্বান করেন। পাণ্ডবরা পাশা খেলায় পরাজিত হন এবং শর্ত অনুযায়ী বনবাসে যান। কিন্তু পাণ্ডবরা ফিরে এলে দুর্যোধন তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্যোধন তা মেনে নেননি। আর তখনই শুরু হয়ে যায় উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ। এটি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নামে পরিচিত। আঠারো দিনব্যাপী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়। দুর্যোধনরা পরাজিত হয়। ধর্মের জয় হলো আর অধর্মের পরাজয় হলো।

এসো এবার আমরা মহাভারতের কাহিনিতে বর্ণিত রাজা শান্তনুর বংশানুক্রমের চিত্রটি আঁকি এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

আমাদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ হলো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণী হলো গীতা। তৃতীয় পাণ্ডব বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে কথোপকথনের পটভূমি হলো এই গীতাগ্রন্থ। তাঁদের এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা, রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। গীতা আত্মরক্ষা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথাও বলেছে। গীতা হলো সকল শাস্ত্রের সারগ্রন্থ। গীতা মানুষকে ধৈর্যশীল, সংযমী, নিরহংকার হতে উপদেশ প্রদান করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। গীতাগ্রন্থে আঠারোটি অধ্যায় এবং সাতশ শ্লোক রয়েছে। এজন্য গীতাকে সপ্তশতী বলা হয়ে থাকে।

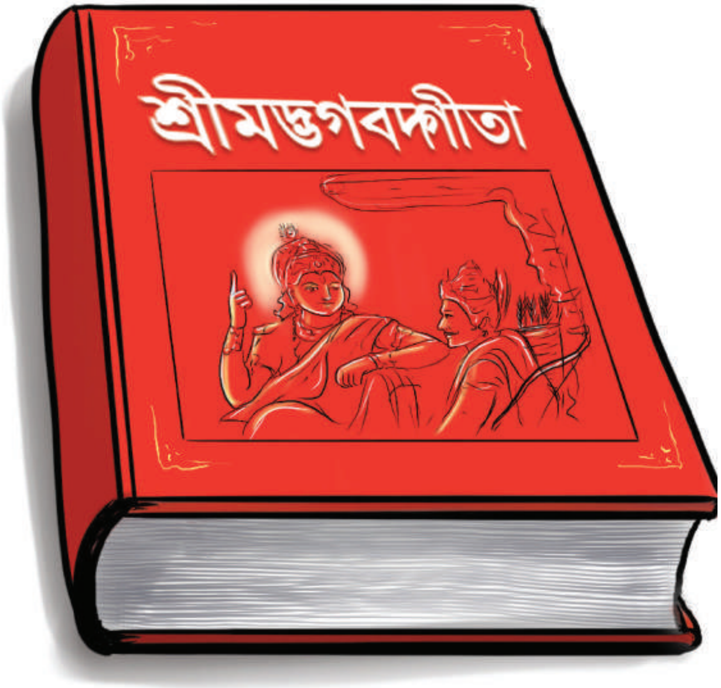

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ যখন শুরু হবে, তখন দুপক্ষের আপনজনদের দেখে মহাবীর অর্জুন খুব বিষণ্ণ ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি কাকে আঘাত করবেন, সকলেই যে তাঁর আত্মীয় প্রিয়জন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, মোক্ষ বিষয়ে নানা উপদেশ দিলেন। তিনি বলেন, আত্মা জন্মরহিত, মৃত্যুহীন; আত্মাকে কোনোরূপেই ধ্বংস করা যায় না। জীবের মধ্যে আত্মা অবস্থান করে। তাই মৃত্যুর মাধ্যমে দেহের ধ্বংস হলেও আত্মার ধ্বংস হয় না। যার যে কর্তব্য তাকে সেই কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। ক্ষত্রিয়ের কাজ হলো দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। তাই ধর্মের জন্য যুদ্ধ করা এবং অধর্মের পরাজয়ের জন্য অর্জুনের যুদ্ধ করা একান্ত কর্তব্য।

এসো দলীয়ভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য যে সকল উপদেশ দিয়েছেন তা থেকে ৫টি উপদেশ নিচের ছকে লিখি এবং পোস্টার আকারে লিখে তা অন্যান্য দলের সঙ্গে শেয়ার করি।

উপদেশ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীচণ্ডী

হিন্দুধর্মাবলম্বীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো শ্রীশ্রীচণ্ডী। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। চণ্ডীতে সাতশ শ্লোক রয়েছে। এর জন্য একে সপ্তশতীও বলা হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে চণ্ডীগ্রন্থ রচিত হলেও বিষয়বস্তু ও রচনার গুণে এটি আলাদা গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের কাহিনি, দেবী মহামায়াসহ নানা কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। সাধারণত দুর্গাপূজা ও বাসন্তীপূজায় চণ্ডী পাঠ করা হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতো চণ্ডীও প্রতিদিন পাঠ করা যায়।

দেবী দুর্গা ও মহিষাসুরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মহিষাসুরকে পরাজিত করে দেবী দুর্গা দেবতাদের মুক্ত করেন। দেবতারা তাঁদের স্বর্গরাজ্য ফিরে পান। স্বর্গ ফিরে পেয়ে তাঁরা আনন্দিত হলেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

তাঁরা দেবীর জয়গান ও স্তব-স্তুতিতে চারদিক মুখরিত করে তোলেন।

শরণাগতদীনার্ত-পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে।।

(চণ্ডী ১১/১২)

সরলার্থ: হে দেবী নারায়ণী, তুমি শরণাগত-দীন ও আর্তের পরিত্রাণকারিণী সকলের আর্তি দূর করো, তোমাকে নমস্কার।

■ এসো, আমরা নিচের মিলকরণটি করি।

বেদ	মহর্ষি বাল্মীকি
উপনিষদ	মোট আঠারোটি পর্ব
রামায়ণ	শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণী
মহাভারত	হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	বেদান্ত
শ্রীশ্রীচণ্ডী	লোকনাথ ব্রহ্মচারী

■ আমরা হিন্দুধর্মের প্রধান গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে ধারণা পেলাম। এ সকল ধর্মগ্রন্থে বিভিন্ন মহান চরিত্রের কথা বর্ণিত আছে। এসো এবার আমরা নিচের তালিকায় উল্লেখিত গুণসম্পন্ন চরিত্রের কথা উল্লেখ করে তার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিই। প্রবন্ধটি অনধিক ৫০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে।

অধ্যবসায়	একাগ্রতা	পিতামাতার প্রতি ভক্তি
বীরত্ব	সাহসিকতা	দায়িত্ববোধ

ঈশ্বরের স্বরূপ : নিরাকার ও সাকার

পূর্বে আমরা বিভিন্ন দেবদেবী এবং অবতার সম্পর্কে জেনেছি। এবার আমার জানা দুইজন দেবদেবী এবং একজন অবতার সম্পর্কে পাঁচ লাইন করে বর্ণনা লিখি। লেখায় ঈশ্বরের সংশ্লিষ্ট রূপ এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে হবে। লেখা শেষে প্রত্যেকেই শ্রেণিতে উপস্থাপন করি এবং অন্যের মতামত শুনি।

আমরা কয়েকজন দেবদেবী এবং অবতার সম্পর্কে জেনেছি ও লিখেছি। এসো এবার আমরা হিন্দুধর্মের আরও কয়েকজন দেবদেবী এবং অবতার সম্বন্ধে জানব।

ঈশ্বরের স্বরূপ

ঈশ্বর নিরাকার ব্রহ্মরূপে সর্বত্র বিরাজমান। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে অনুভব করি। তিনি নিত্য, শুদ্ধ ও পরম পবিত্র। সর্বশক্তিমান নিরাকার ঈশ্বরের বিশেষ কোনো গুণ বা শক্তির সাকার রূপ হলো দেবতা বা দেবদেবী। তাই হিন্দুধর্মে বিভিন্ন দেবদেবীর কথা উল্লেখ রয়েছে। আমরা ঈশ্বরের সাকাররূপী বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে থাকি। এছাড়া ঈশ্বর দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য জীবদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে আসেন। তাঁর এই আসা বা অবতরণ করাকে বলা হয় অবতার।

বিশ্বকর্মা দেবতা

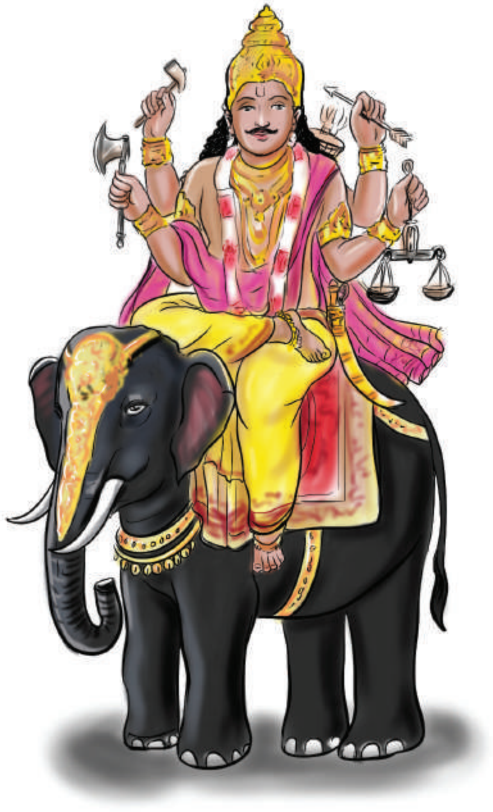

বিশ্বকর্মা দেবতা

বিশ্বকর্মা বিশ্বভুবনের স্থপতি। তিনি শিল্প ও পুরকৌশলের দেবতা। শিল্পনৈপুণ্য, স্থাপত্যশিল্প এবং কারুকার্য সৃষ্টিতে তিনি অনন্য গুণশালী দেবতা। পুরাণ অনুসারে তিনি দেবশিল্পী। তিনি স্থাপত্য বেদ নামে একটি উপবেদের রচয়িতা। বিশ্বকর্মা দেবের চার হাত। তাঁর বাম দিকের এক হাতে আছে ধনুক আর এক হাতে তুলাদণ্ড। ডান দিকের এক হাতে হাতুড়ি, অন্য হাতে আছে কুঠার। তাঁর বাহন হাতি। তাঁর কৃপায় মানুষ শিল্পকলা ও যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। তিনি অলংকার শিল্পেরও স্রষ্টা। দেবতাদের বিমান ও অস্ত্রনির্মাতা। তিনি পুষ্পকরথ, শিবের ত্রিশূল, ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, কুবেরের অস্ত্র ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরীও নির্মাণ করেছেন।

ভাদ্র মাসের শেষ দিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন বিশ্বকর্মার পূজা করা হয়। যারা যন্ত্র ও যন্ত্রকৌশলের সঙ্গে যুক্ত তাদের মধ্যে তাঁর পূজার প্রচলন সর্বাধিক। বাংলাদেশে স্বর্ণকার, কর্মকার, কারুশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি শিল্পকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণও বিশ্বকর্মার পূজা করে থাকেন।

জগদ্ধাত্রী দেবী

জগদ্ধাত্রী দেবী

জগদ্ধাত্রী দেবী দুর্গার একটি রূপ। বাঙালি হিন্দুসমাজে দেবী দুর্গা ও কালীর পরেই দেবী জগদ্ধাত্রীর স্থান। জগদ্ধাত্রী শব্দের আভিধানিক অর্থ জগতের ধাত্রী বা পালিকা। জননীরূপে তিনিই বিশ্বপ্রসূতি, আবার ধাত্রীরূপে তিনিই বিশ্বধাত্রী। মহাদেবী জগদ্ধাত্রী নানা অলংকারে ভূষিতা হয়ে সিংহের ওপরে আরোহণ করে থাকেন।

জগদ্ধাত্রী দেবী ত্রিনয়না। দেবীর গাত্রবর্ণ উদীয়মান সূর্যের ন্যায়। তাঁর চার হাত। বাম দিকের দুই হাতে আছে শঙ্খ ও ধনুক। ডান দিকের দুই হাতে আছে চক্র ও বাণ। গলায় সর্পপৈতা। রক্তলালবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা এ দেবীর বাহন সিংহ। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শীতলা দেবী

শীতলা দেবী হিন্দুদের একজন লৌকিক দেবী। পুরাণ অনুসারে শীতলা দেবী আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গারই একটি রূপ। এজন্য মা শীতলাকে অনেকে পৌরাণিক দেবীও বলে থাকেন। ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষত উত্তর ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল, বাংলাদেশে শীতলা দেবীর পূজা করা হয়।

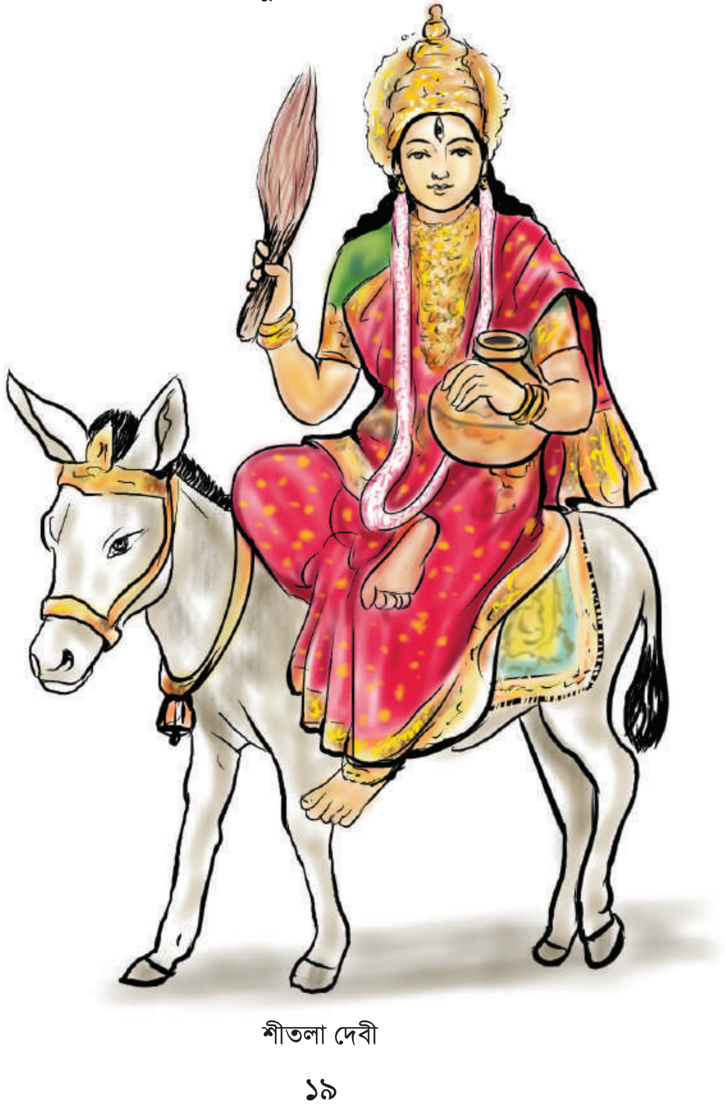

শীতলা দেবী

দোলপূর্ণিমার পর অষ্টমী তিথিতে শীতলা দেবীর পূজা করা হয়। এই তিথিটি শীতলাষ্টমী নামে পরিচিত।

বসন্ত ঋতু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রকাশ হয়। কিন্তু এ ঋতুতে রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। বসন্ত ও চর্মরোগ দেখা যায়। এর থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে মা শীতলা পূজা করা হয়। ভক্তগণের মতে, এ দেবীর পূজা করলে বসন্ত রোগের জ্বালা নিবারণ হয়ে শরীর শীতল হয়ে যায়। এ কারণে এ দেবী শীতলা নামে পরিচিত হয়েছেন। শীতলা দেবীর এক হাতে থাকে সম্মার্জনী বা ঝাড়ু, আর অন্য হাতে থাকে জলের কলস। ভক্তদের ব্যাখ্যায়, ওই ঝাড়ু দিয়ে দেবী সমস্ত জীবাণু নষ্ট করে জল দিয়ে রোগ নির্মূল করেন। কখনো কখনো তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন। নিম রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ। শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবী বলা হয়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি। অপদেবতার হাত থেকেও তিনি রক্ষা করেন। তাঁর কৃপায় সকল অমঙ্গল দূর হয়।

শীতলা দেবীর মাথায় কুলা-আকৃতি মুকুট এবং গর্দভের উপর তিনি উপবিষ্ট থাকেন। গর্দভ তার বাহন। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত শীতলা দেবী শ্বেতবর্ণা ও দুই হাত বিশিষ্ট।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবীর সম্পর্কে যা জানলাম, এসো তার আলোকে নিচের ঘরগুলো পূরণ করি

দেবদেবী	দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য	আরাধনার কারণ	বাহন	পূজার সময়
বিশ্বকর্মা দেবতা				
জগদ্ধাত্রী দেবী				
শীতলা দেবী				

আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে অবতার সম্পর্কে জেনেছি। পূর্বের জ্ঞানের আলোকে অবতারগণ কেন পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তা নিয়ে নিজের ভাবনা নিচের বক্সে লিখি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আমরা জানি পৃথিবীতে যখন অধর্ম বেড়ে যায়, তখন সৃষ্টিকর্তা বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়ে অধর্মকে বিনাশ করে ধর্ম রক্ষা করেন। সৃষ্টিকর্তাই আমাদের মঙ্গলের জন্য অবতাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। পূর্বে আমরা এরকম কয়েকজন অবতার সম্বন্ধে জেনেছি, এখন আমরা আরও কয়েকজন অবতার সম্পর্কে জানব।

অবতার

মাঝে মাঝে পৃথিবীতে খুব অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মানুষ ভালো পথ থেকে খারাপ পথে চলে যায়। ধর্মের পথ থেকে চলে যায় অধর্মের পথে। অধার্মিক তথা দুষ্ট লোকেরা প্রবল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সমাজের ভালো মানুষ তথা ধার্মিকদের জীবনে নেমে আসে নিপীড়ন ও নির্যাতন। এমতাবস্থায়, পৃথিবীতে যখন অধর্ম বেড়ে যায়, তখন সৃষ্টিকর্তা বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন। আর্বিভূত হয়ে তিনি অধর্মকে বিনাশ করে ধর্ম রক্ষা করেন। সৃষ্টিকর্তাই আমাদের মঙ্গলের জন্য অবতাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। এসময় সৃষ্টিকর্তা বা ভগবান বিষ্ণু দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেন। তিনি মানুষ বা অন্য কোনো জাগতিক রূপ নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁর সেই জাগতিক রূপকে অবতার বলা হয়। অবতার দুই প্রকার—পূর্ণ অবতার ও অংশ অবতার। বিষ্ণু পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হলে তাঁকে পূর্ণ অবতার বলে। অংশরূপে অবতীর্ণ হলে তাঁকে অংশ অবতার বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী ‘কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্’ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবান। তাই পূর্ণ অবতার হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। দশজন অংশ অবতারের কথা বিশেষভাবে জানা যায়। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা চারজন অবতারের পরিচয় জেনেছি। এখানে অবশিষ্ট ছয়জন অবতারের পরিচয় জানব।

বামন অবতার

ভগবান বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার হলো বামন অবতার। দৈত্যরাজ বলিকে দমন করার জন্য শ্রীহরি বামনরূপে সত্য যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এক সময় প্রহ্লাদের নাতি দানবরাজ বলি স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকে পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন এবং দেবলোক থেকে দেবতাদের তাড়িয়ে দেন। দেবতারা এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিষ্ণুর আরাধনা শুরু করেন। তাঁদের আরাধনায় তিনি সন্তুষ্ট হন। বিষ্ণু বলির হাত থেকে দেবতাদের রক্ষার অঙ্গীকার করেন। তখন শ্রীহরি বামন বা খর্বাকার রূপ ধারণ করেন। দৈত্যরাজ বলি তখন এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি প্রচার করেন, এই যজ্ঞে তাঁর কাছে যে যা চাইবে তিনি তাকে তাই দিবেন। ভগবান এই সুযোগে বামনরূপী বিষ্ণু বলির কাছে ত্রিপাদ পরিমাণ ভূমি প্রার্থনা করেন।

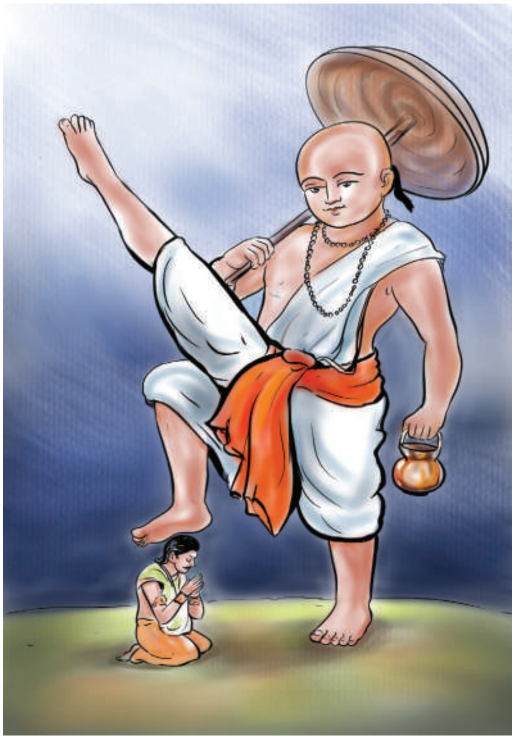

বামন অবতার

অর্থাৎ তিনটি পা ফেলার মতো জায়গা। এ কথা শুনে দানবরাজ হেসে উঠলেন। ক্ষুদ্রকায় বামনের তিন পা পরিমাণ ভূমি খুবই সামান্য ব্যাপার। তিনি বামনের কথায় রাজি হয়ে গেলেন। তখনই বামনদেবের তিন পা হঠাৎ করে অনেক বড় হয়ে গেল। তিনি তাঁর প্রথম পা পৃথিবীতে রাখলেন। দ্বিতীয় পা স্বর্গে রাখলেন। তাঁর নাভির দিক থেকে আর একটি পা বের হলো। এই তৃতীয় পা তিনি কোথায় রাখবেন? তখন দৈত্যরাজ বলি কী করবেন! তিনি বামনকে কথা দিয়েছেন। কথা রাখতে হবে। কোনো উপায় না দেখে তিনি তার নিজের মস্তক এগিয়ে দিলেন। বামন বলির মস্তকে তৃতীয় পা রাখলেন। এভাবে বামনরূপে ভগবান বিষ্ণু বলিকে দমন করলেন। দেবতারা দেবলোক ফিরে পেলেন। সর্বত্র শান্তি স্থাপিত হলো। এখানে একটি কথা, কারও কাছে কিছু প্রার্থনা বা চাইতে গেলে অবনত হতে হয়। ভগবান বিষ্ণুকেও বলির কাছে প্রার্থনা করতে অবনত হতে হয়েছিল। তাঁকে ক্ষুদ্রকায় বামনরূপ ধরতে হয়েছিল।

পরশুরাম অবতার

পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। 'পরশুরাম' নামের আক্ষরিক অর্থ কুঠার হস্তে রাম। তখন ত্রেতা যুগ। এই সময় ক্ষত্রিয় রাজারা প্রবল শক্তিশালী হয়েছিল। তাঁরা অত্যাচারী হয়ে উঠল। ক্ষত্রিয় রাজাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রজারা ভগবান বিষ্ণু ও ব্রহ্মার স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। তাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণুদেব পরশুরামরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরশুরামের পিতার নাম জমদগ্নি, মাতা রেণুকা। তিনি ক্ষত্রিয় রাজাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন এবং হাতে তুলে নেন পরশু বা কুঠার নামক এক বিশেষ অস্ত্র। তখন থেকেই তাঁর নাম হয় পরশুরাম। পরশুরাম ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করেছেন। যুদ্ধ করেছেন। তিনি একুশবার এ পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, ক্ষমতার দম্ভ হলে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে বিষ্ণু কোনো রূপ ধারণ করে দম্ভ চূর্ণ করেন।

পরশুরাম অবতার

রাম অবতার

রামচন্দ্র ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। তিনি ছিলেন অযোধ্যার রাজা দশরথ এবং কৌশল্যার পুত্র। রামচন্দ্র ছিলেন অশেষ গুণের অধিকারী।

আমরা রামায়ণ থেকে রামের কথা জানি। রামের স্ত্রীর নাম সীতা। পিতার দেয়া শর্ত রক্ষা করার জন্য তিনি স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে যান। এই সময় লংকার রাজা ছিলেন রাবণ। রাবণ ছিলেন রাক্ষসদের রাজা। তিনি খুবই অত্যাচারী এবং শক্তিশালী ছিলেন। দেবতাদেরও তিনি পরাজিত করেন। তাঁর অত্যাচারে পৃথিবীতে চরম অশান্তির সৃষ্টি হয়। এক সময় রাবণ সীতাকে অপহরণ করেন। রামচন্দ্র বানর সৈন্যদের নিয়ে রাবণকে সবংশে বিনাশ করেন এবং স্ত্রী সীতাকে উদ্ধার করেন। পৃথিবী রাক্ষসমুক্ত হয়। রাবণের মৃত্যুতে সর্বত্র শান্তি ফিরে আসে। বিষ্ণুর অবতার হিসেবে রামচন্দ্র ছিলেন সত্যের রক্ষক, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাবৎসল রাজা। তাঁর শাসনে প্রজারা খুব সুখী ছিলেন।

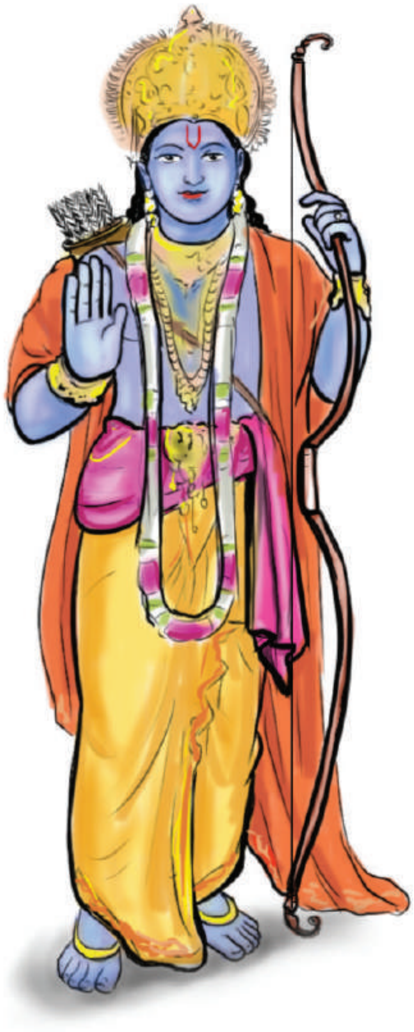

রাম অবতার

বলরাম অবতার

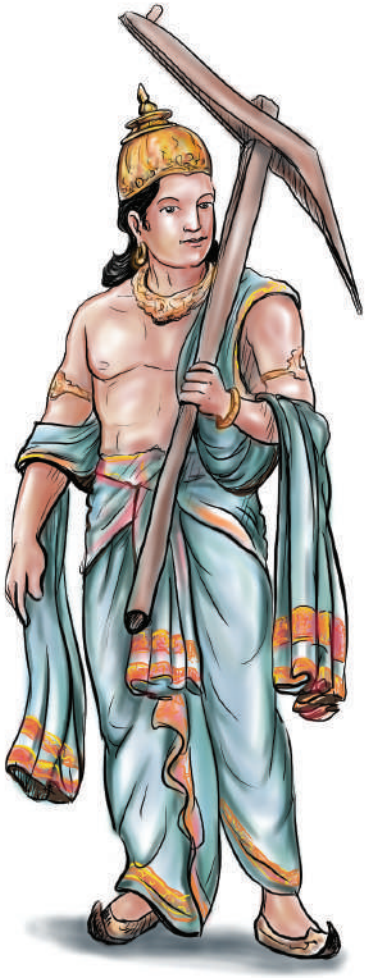

বলরাম অবতার

ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার হলেন বলরাম। তিনি বলভদ্র নামেও পরিচিত। তাঁর পিতা বসুদেব ও মাতা রোহিণী। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বড়ো ভাই।

তাঁর প্রধান অস্ত্র ছিল 'হল' বা 'লাঙল'। তাই তিনি হলধর নামেও পরিচিত। তখনকার দিনে যমুনা নদী বৃন্দাবন থেকে বেশ কিছুটা দূর দিয়ে প্রবাহিত হতো। ফলে কৃষকদের কৃষিকাজ করতে বেশ পরিশ্রম করতে হতো। বলরাম তাঁর লাঙল দিয়ে মাটি খুঁড়ে যমুনাকে বৃন্দাবনের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। এতে বৃন্দাবনবাসীদের অনেক সুবিধা হয়। তিনি জগৎকে এই বার্তা দিয়ে গেছেন যে, দলনিরপেক্ষ ও গোষ্ঠীনিরপেক্ষভাবে সব কৃষককে কৃষির মাধ্যমে দেশের কাজে নিয়োজিত হতে হবে। তিনি কৃষকদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর অনন্ত আশীর্বাদ। এছাড়া তিনি ছিলেন অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। তিনি অনেক অত্যাচারীকে শাস্তি দিয়ে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তিনি বাল্যকালে ধেনুকাসুর ও প্রলম্ব অসুরকে হত্যা করেন। তিনি এবং তাঁর ছোটো ভাই শ্রীকৃষ্ণ মিলে অত্যাচারী কংস রাজাকে হত্যা করেন। কংস এবং তাঁর অনুসারীদের মৃত্যুতে সমাজে শান্তি ফিরে আসে।

বুদ্ধ অবতার

বুদ্ধদেব শ্রীবিষ্ণুর নবম অবতার। ভগবান বুদ্ধদেবকে শান্তি এবং জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয় শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শুদ্ধোদন এবং মাতার নাম মায়াদেবী। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তাঁর আরেক নাম গৌতম। তিনি এক সময় স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে সংসার ত্যাগ করেন।

ছোটোবেলা থেকে মানুষের বার্ধক্য, অসুস্থতা, মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি খুব চিন্তিত হন। এর থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এটাই ছিল তাঁর চিন্তা। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি দুঃখের কারণ থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধানের জন্য কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশেষে ৩৫ বছর বয়সে তিনি বোধি অর্জন করেন। বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর নাম হয় বুদ্ধ। তাঁর অনুসারীদের বলা হয় বৌদ্ধ।

দুঃখবিদ্ধ মানুষের যন্ত্রণা দূর করা এবং অকারণে প্রাণী হত্যা বন্ধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর মতে প্রাণী হত্যা মহাপাপ। প্রত্যেক প্রাণী তার নিজের জীবনকে ভালোবাসে। তাই কোনো প্রাণীকে আঘাত দেওয়া বা হত্যা করা যাবে না। তিনি মানুষকে হিংসার পরিবর্তে ভালোবাসার শিক্ষা দিয়েছেন। বুদ্ধদেবের সময় সমাজে অনেক খারাপ অবস্থা ছিল। তিনি সমাজের অনেক কুসংস্কার দূর করেন। জাতিভেদ, বর্ণভেদ দূর করেন। তিনি মানুষের সদাচরণ ও সৎ চিন্তার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সকলের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ গ্রহণ করলে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে।

বুদ্ধ অবতার

কল্কি অবতার

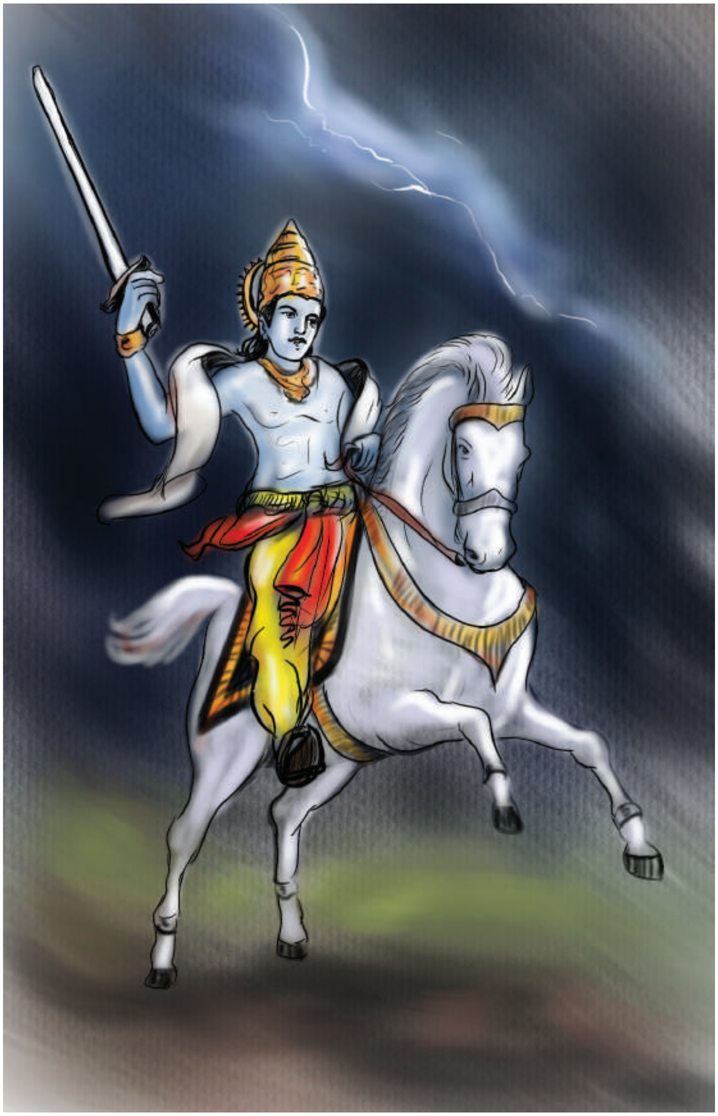

কল্কি অবতার

হিন্দুধর্ম অনুসারে কল্কিদেব বিষ্ণুর দশম অবতার। তিনি কলি যুগের অবসান ঘটাবেন। কলিযুগ হলো চার যুগের শেষ যুগ। কলিযুগে অধর্ম খুব বেড়ে যাবে। কলিযুগের শেষে সমাজে ক্ষমতাবান দুষ্ট লোকেরা আসুরিক আচরণ করবে এবং মন্দ কাজে লিপ্ত হবে। এ সময় ভগবান বিষ্ণু কল্কি অবতাররূপে এই পৃথিবীতে আসবেন। তিনি বিষ্ণুযশা ও সুমতির পুত্ররূপে সম্ভল নামক এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি কলিযুগের শেষের দিকে জন্ম নেবেন। তখন এই পৃথিবীর অল্পসংখ্যক মানুষ ব্যতীত সকলেই ধর্মকে ভুলে যাবে। ভালো মানুষদের নিয়ে লোকে হাসিঠাট্টা ও বিদ্রুপ করবে। মন্দলোক ভালো লোকদের পশুর মতো মারবে। গোটা পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে নরকে পরিণত হবে। ঠিক তখনই মহাশক্তিশালী, ক্ষমতাধর এবং মহানুভব কল্কিদেব অবতীর্ণ হবেন। তিনি দেবদত্ত নামক একটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে হাতে তরবারি নিয়ে সমস্ত অন্যায়কারীকে বিনাশ করবেন। দুষ্ট ও অধার্মিক মানুষদের ভয়ানক প্রভাব থেকে তিনি পৃথিবীকে রক্ষা করবেন। কল্কিদেব পুনরায় সুস্থ সমাজগঠনে ও ধর্মস্থাপনে আবির্ভূত হবেন। পৃথিবীতে আবার শান্তি ফিরে আসবে। শুরু হবে সত্যযুগের।

- এতক্ষণ আমরা বামন অবতার, পরশুরাম অবতার, রাম অবতার, বলরাম অবতার, বুদ্ধ অবতার, এবং সর্বশেষ কল্কি অবতারের বিষয়ে জানলাম। এসো এবার নিচের ছকটি পূরণ করি।

অবতারগণ	বিষ্ণুর কততম অবতার	মানবকল্যাণে করা কাজ
বামন অবতার		
পরশুরাম অবতার		
রাম অবতার		
বলরাম অবতার		
বুদ্ধ অবতার		
কল্কি অবতার		

মন্ত্র, শ্লোক ও প্রার্থনামূলক কবিতা

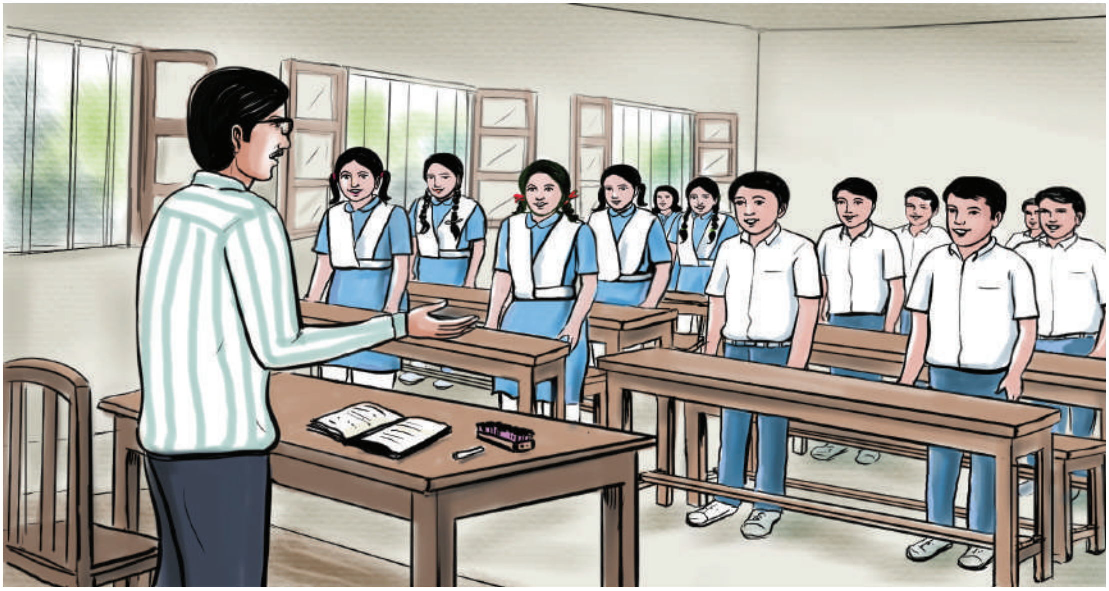

- চলো, আজ আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিচের গানটি সমস্বরে গাই।

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়॥

সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে—
দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।

- (গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

- উপরের গানটি আমাদের খুব পরিচিত। অনেক সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার সময় আমরা এ গানটি গেয়ে থাকি। উপরের গানটিতে ঈশ্বরের নিকট কী চাওয়া হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে নিচের বক্সে লিখি।

- গান, কবিতা, মন্ত্র, শ্লোকের মাধ্যমে আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে থাকি। এবার বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত এ সকল প্রার্থনামূলক গান, কবিতা, মন্ত্র, শ্লোক সম্পর্কে জানব।

মন্ত্র, শ্লোক ও প্রার্থনামূলক কবিতা

আবহমানকাল থেকে মন্ত্র, শ্লোক, প্রার্থনামূলক কবিতা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বয়ং ভগবানের স্তব-স্তুতি বা গুণগান করা হয়েছে। কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো।

বেদ

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ-
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ।। (ঋগ্বেদ ১০/৯০/১)

শব্দার্থ : সহস্রশীর্ষা - হাজার মস্তক, পুরুষঃ - পরম পুরুষ বা ঈশ্বর, সহস্রাক্ষঃ (সহস্র+অক্ষঃ) - হাজার চক্ষু, সহস্রপাৎ-হাজার পা বা চরণ, সঃ - তিনি, ভূমিং - ভূমি, বিশ্বতো - জগৎ বা পৃথিবী, বৃত্বা - ব্যাপ্ত করে বা অতিক্রম করে, অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ (অতি+অতিষ্ঠৎ+দশ+অঙ্গুলম্) - দশ অঙ্গুলি অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করেন।

সরলার্থ : পরম পুরুষ বা ঈশ্বরের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি জগৎকে সর্বত্র অতিক্রম করে দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করেন।

- এখানে প্রদত্ত বেদের মন্ত্রটি বাদে আমাদের জানা অন্য যে কোনো একটি মন্ত্র বা শ্লোক অনুবাদসহ লিখি।

উপনিষদ

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্ ।। (ঈশোপনিষদ)

শব্দার্থ : ঈশা - ঈশ্বরের দ্বারা; বাস্যম্ - আচ্ছাদিত বা বাসের নিমিত্ত; ইদম্ - এই; সর্বম্ - সমস্ত; যৎ কিঞ্চ জগত্যাম্ - যা কিছু জগতে; জগৎ-চলমান; তেন - তার দ্বারা; ত্যক্তেন - ত্যাগের সঙ্গে; ভুঞ্জীথাঃ - ভোগ করবে; মা - না; গৃধঃ - লোভ; কস্যস্বিদ্ ধনম্ - কারও ধনে।

সরলার্থ : এই গতিশীল বিশ্বে যা কিছু চলমান বস্তু আছে, তা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত মনে করবে। ত্যাগের সঙ্গে ভোগ করবে, কারও ধনে লোভ কোরো না।

■ এসো নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখি।

শব্দ	
ঈশা	
কিঞ্চ	
বাস্যমিদং	
ভুঞ্জীথাঃ	
ধনম্	

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ।। (৪/৩৯)

শব্দার্থ : শ্রদ্ধাবান্ - শ্রদ্ধাশীল; লভতে - লাভ করেন; জ্ঞানম্ - জ্ঞান; তৎপরঃ - নিপুণ; সংযতেন্দ্রিয়ঃ (সংযত ইন্দ্রিয়ঃ) - জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি; জ্ঞানং লব্ধা - জ্ঞানলাভ করে; পরাম্ - পরম; শান্তিম্ - শান্তি; অচিরেণ - শীঘ্র; অধিগচ্ছতি - পেয়ে থাকেন।

সরলার্থ : শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে থাকেন। জ্ঞান লাভ করার পর শীঘ্র তিনি পরম শান্তি পেয়ে থাকেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ।। (১১/৭)

শব্দার্থ : সর্বভূতা-সর্বস্বরূপা; যদা-যখন; দেবী- দেবী; স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী - স্বর্গ এবং মুক্তিদানকারিণী; ত্বং - তুমি; স্তুতা - তোমার স্তব করলে; স্তুতয়ে - স্তবের জন্য; কা বা - কিছুই বা; ভবন্তু - হবে বা হতে পারে; পরমোক্তয়ঃ - শ্রেষ্ঠ বা পরম বাক্য।

সরলার্থ: তুমি সর্বস্বরূপা দেবী, তুমি স্বর্গ এবং মুক্তি দান করে থাক। কাজেই তোমাকে স্তব করতে হলে কোন শ্রেষ্ঠ বা পরম বাক্য তোমার স্তবের জন্য যোগ্য হবে।

প্রার্থনামূলক কবিতা

তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক্, মোর মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্ অকুল-গরল-পাথারে!
প্রভু, বিশ্ব-বিপদহন্তা, তুমি দাঁড়াও, রুধিয়া পন্থা;
তব, শ্রীচরণ তলে নিয়ে এস, মোর মত্ত-বাসনা ঘুচায়ে!

আছ অনল-অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধরসলিলে, গহনে;
আছ বিটপীলতায়, জলদের গায়, শশীতারকায়, তপনে।
আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া, বসে আঁধারে মরিব কাঁদিয়া;
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

– রজনীকান্ত সেন

মিল কর	
বেদ	তুমি সর্বস্বরূপা দেবী
উপনিষদ	প্রভু, বিশ্ব-বিপদহন্তা, তুমি দাঁড়াও, রুধিয়া পন্থা
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	তিনি জগৎকে সর্বত্র অতিক্রম করেন
শ্রীশ্রীচণ্ডী	শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়
প্রার্থনামূলক কবিতা	কারও ধনে লোভ কোরো না

- উপরে আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে রচিত বিভিন্ন মন্ত্র, শ্লোক ও কবিতা জানলাম। এবার রজনীকান্ত সেনের প্রার্থনামূলক কবিতাটির অনুরূপ একটি প্রার্থনামূলক কবিতা বা গান নির্বাচন করি এবং নিচের ঘরে লিখি। কবিতা বা গানটি শ্রেণিকক্ষে সবাই একসঙ্গে আবৃত্তি করি বা গাই।

পূজা-পার্বণ, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

- নিচের ছবিটি ভালো করে লক্ষ করি। নিশ্চয়ই বিভিন্ন পূজা-পার্বণে বা মন্দিরে আমরা এটা দেখে থাকব। এসো ভালোভাবে এটা পর্যবেক্ষণ করি।

- বিভিন্ন পার্বণে বা মন্দিরে এরকম আরও অনেক ধরনের আলপনা দেখা যায়। প্রয়োজনে বিভিন্ন মন্দিরে গিয়ে আলপনা দেখে আসতে পারি। এবার পার্বণে বা বিভিন্ন মন্দিরে আমার দেখা কিছু আলপনার চিত্র নিচের ৪টি ঘরে অঙ্কন করি।

- আলপনা অর্থ লেপন করা। অর্থাৎ রংতুলির ছোঁয়ায় বিভিন্ন ধরনের নকশা আঁকাই হচ্ছে আলপনা। সাধারণত একটি বা দুটি রঙের সহজ রেখাচিত্রের সাহায্যে আলপনা আঁকা হয়। বাড়ির চৌকাঠে, বারান্দায়, আঙিনায়, বিয়ের পিঁড়িতে, পূজা-পার্বণে, মণ্ডপে ইত্যাদি স্থানে সাদা এবং বিভিন্ন রঙের আলপনার প্রচলন আছে।

- এই যে আমরা বিভিন্ন ধরনের আলপনা আঁকলাম, এগুলো আমাদের পূজা-পার্বণ, মন্দিরে ব্যবহার করা হয়। চলো আমরা এই পূজার্চনা, পার্বণ কীভাবে পালন করি তার নিয়মকানুন জানি। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রগুলো কোন কোন পূজা, স্থাপত্যশৈলী বা আর কী কী কারণে বিখ্যাত সেগুলো জানার চেষ্টা করি।

পূজা-পার্বণ

আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছি, পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা করা। নিরাকার ঈশ্বরের সাকার রূপ হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন দেব-দেবীকে আমরা বিভিন্নভাবে আরাধনা করি। ফুল-ফল ও নানা উপচার দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। এই শ্রদ্ধা নিবেদন করার প্রক্রিয়াই হলো পূজা। পূজার মাধ্যমে সকল অশুভ শক্তি দূর হয়। জীবের কল্যাণ সাধিত হয়। আবহমান কাল থেকে আমাদের প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনে মঙ্গল কামনায় যে সমস্ত আনন্দ উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা করা হয় তা-ই পার্বণ। এখন আমরা কয়েকজন দেবদেবী সম্পর্কে জানব। তাঁরপর পার্বণ সম্পর্কে জানব।

লক্ষ্মীদেবীর পরিচয়

লক্ষ্মীদেবী ধনসম্পদ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী। তাঁর অপর নাম শ্রী। দেবী লক্ষ্মী ভগবান বিষ্ণুর সহধর্মিণী। তিনি স্নিগ্ধতা ও সুন্দরের প্রতীক। আমাদের পরিবার ও সমাজের উন্নতি নির্ভর করে সম্পদের ওপর। এই সম্পদগুলোর মধ্যে ভূমি, শস্য, জ্ঞান, সততা, শুদ্ধতা ইত্যাদি অন্যতম। এসব সম্পদ অর্জনের জন্য লক্ষ্মীদেবীর পূজা করা হয়।

লক্ষ্মীদেবী পদ্মফুলের ওপর উপবিষ্ট। তিনি গৌরবর্ণা। তাঁর দুটি হাত। এক হাতে তিনি ধরে থাকেন পদ্ম আর এক হাতে অমৃতের কলস। তাঁর বাহন পেঁচা। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। এ পূজা কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা নামে পরিচিত। এছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার বাংলার ঘরে ঘরে পাঁচালি পড়েও লক্ষ্মীপূজা করা হয়।

পূজা পদ্ধতি

যে কোনো পূজা করতে পূজা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। পূজার ক্ষেত্রে শুদ্ধ আসনে বসে আচমন থেকে শুরু করে পঞ্চদেবতার পূজা করতে হয়। পঞ্চদেবতারা হলেন গণেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু ও দুর্গা। এ পূজায় বিভিন্ন ধরনের আলপনা বা চিত্র আঁকা হয়।

বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করা হয়। লক্ষ্মীপূজা এর উপকরণ পঞ্চোপচার, দশোপচার বা ষোড়শ উপচারে করা হয়ে থাকে। পূজায় ধানের ছড়া, পঞ্চশস্য, সোনা, রুপা, কাঁচা হলুদ, মধু, দধি ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা হয়। নলটুলীফুল ও পদ্মফুল লক্ষ্মীদেবীর প্রিয় ফুল। এ পূজার মৌলিক নীতি হিসেবে দেবী লক্ষ্মীর ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলিমন্ত্র, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, প্রণামমন্ত্র পাঠ প্রভৃতি করতে হয়। অবশেষে লক্ষ্মীদেবীর পাঁচালি পাঠ করে এয়োগণ একে অপরকে সিঁদুর পরিয়ে দেন।

লক্ষ্মীদেবীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

ওঁ নমস্তে সর্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎ প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চনাৎ।

শব্দার্থ : ওঁ নমস্তে - তোমাকে নমস্কার বা প্রণাম; সর্বভূতানাং - সকল প্রাণীর; বরদাসি - বরদান, আশীর্বাদ বা মঙ্গল; হরিপ্রিয়ে - হে হরিপ্রিয়া; যা - যে, গতিঃ - গতি, ত্বৎ - তোমার; প্রপন্নানাং - আশ্রিত বা শরণাগত; সা - সেই; মে - আমার; ভূয়াত্ত্বদর্চনাৎ (ভূয়াৎ ত্বৎ অর্চনাৎ) -তোমার অর্চনার দ্বারা হোক।

সরলার্থ : হে হরিপ্রিয়া, তুমি সকল প্রাণীকে বরদান করো। তোমার আশ্রিতদের যে গতি হয়, তোমার অর্চনার দ্বারা আমারও যেন সেই গতি হয়। তোমাকে নমস্কার।

লক্ষ্মীদেবীর প্রণামমন্ত্র

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে।

শব্দার্থ : বিশ্বরূপস্য - বিশ্বরূপের; ভার্যাসি - বিষ্ণুর স্ত্রী; পদ্মে - পদ্মা; পদ্মালয়ে - পদ্মের আলয়; শুভে - শুভফল; সবর্তঃ - সবদিক থেকে; পাহি - রক্ষা করো; মাং - আমাকে; মহালক্ষ্মি - মহালক্ষ্মী; নমোঽস্তু তে - তোমাকে নমস্কার।

সরলার্থ : হে দেবী মহালক্ষ্মী, বিশ্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর সহধর্মিণী, তুমি পদ্মা, পদ্মের আলয়ে বাস করো। তুমি সকলকে শুভফল দাও। আমাকেও সকল ক্ষেত্রে রক্ষা কোরো। তোমাকে প্রণাম করি।

■ লক্ষ্মীপূজায় আবশ্যকীয় উপকরণগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

লক্ষ্মীপূজার গুরুত্ব:

লক্ষ্মীপূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় প্রতি হিন্দু বাঙালি গৃহেই সাড়ম্বরে লক্ষ্মীদেবীর পূজা হয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথি ছাড়াও প্রতি বৃহস্পতিবার এবং বিশেষ বিশেষ পূর্ণিমা তিথিতে দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। দেবী লক্ষ্মী ধনসম্পদের দেবী। তিনি পূজারিকে ধনসম্পদ দান করে থাকেন। লক্ষ্মীদেবীর পূজা করলে সংসারের শ্রী বৃদ্ধি হয়। পূজারীর মন শান্ত হয়। সেই সঙ্গে সংসারে শান্তি স্থাপিত হয়। লক্ষ্মীপূজায় বিভিন্ন নকশার চিত্র এবং আলপনা আঁকা হয়। এই আলপনার মধ্যে ধানের ছড়া, লক্ষ্মীদেবীর পায়ের ছাপ, বিভিন্ন মুদ্রার ছাপ, পেঁচার পায়ের ছাপ ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা হয়। এর মাধ্যমে সাধারণ গৃহবধূদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এই পূজার মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ একে অপরের অনেক কাছে চলে আসে। তাদের মধ্যে কুশল বিনিময় হয়। এতে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের গভীরতা আরও বৃদ্ধি পায়।

■ লক্ষ্মীপূজায় ব্যবহৃত যেকোনো একটি আলপনা আঁকি।

নারায়ণদেবের পরিচয়

ভগবান বিষ্ণুর অপর নাম নারায়ণ। তাকে বাস্তুদেবতাও বলা হয়। তিনি পাপ মোচন ও বিঘ্ন নাশকারী দেবতা। 'নার' বা 'নারা' শব্দের অর্থ মানুষ এবং 'অয়ন' শব্দের অর্থ আশ্রয়। সুতরাং নারায়ণ শব্দের অর্থ সব মানুষ বা সব জীবের আশ্রয়স্থল। তিনি পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম ও পরমেশ্বর নামেও পরিচিত। নারায়ণদেবের গায়ের রং উজ্জ্বল নীল। তাঁর চারটি হাতে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পায়। দুষ্টের বিনাশের জন্য তিনি যেমন গদা ও চক্র ধারণ করেন। ঠিক তেমনি সৎ ও সাধুদের রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর হৃদয় হয়ে ওঠে পদ্মের মতো কোমল। তিনি এ জগতের সব প্রাণী পালন করে থাকেন, এ কারণে তাঁকে সকল প্রাণীর পালনকর্তা বলা হয়। তাঁর বাহন গরুড় পাখি।

পূজা পদ্ধতি

প্রতিমারূপে, শালগ্রাম শিলারূপে, তাম্রপাত্রে বা জলে নারায়ণ পূজা করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা গৃহ প্রবেশ বা যে কোনো শুভ সূচনাতে নারায়ণ পূজা করে থাকে। বিশেষভাবে নির্ধারিত মন্ত্রে নারায়ণ পূজা করা হয়। পূজা শেষে ব্রতকথা শ্রবণ করে আরতি করা হয়। সাদা ও হলুদ ফুল এবং তুলসীপাতা নারায়ণের খুব প্রিয়। যে কোনো মাসের সংক্রান্তিতে, শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে অথবা বৈশাখ মাসে নারায়ণ পূজার প্রচলন বেশি লক্ষ করা যায়।

নারায়ণ দেব

নারায়ণদেবের পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

ওঁ নমস্তে বিশ্বরূপায় শঙ্খচক্রধরায় চ।
পদ্মনাভায় দেবায় হৃষীকপতয়ে নমঃ।।

শব্দার্থ : ওঁ নমস্তে - তোমাকে নমস্কার; বিশ্বরূপায় - বিশ্বরূপকে; শঙ্খচক্রধরায় - শঙ্খচক্রধারীকে; চ - এবং; পদ্মনাভায় - পদ্ম নাভিতে যাঁর তাঁকে; দেবায় - দেবকে; হৃষীকপতয়ে - ইন্দ্রিয়াধিপতিকে; নমঃ - নমস্কার।

সরলার্থ : বিশ্বরূপকে অর্থাৎ বিষ্ণুদেবতাকে প্রণাম। শঙ্খচক্রধারীকে, পদ্মনাভকে, ইন্দ্রিয়াধিপতি নারায়ণদেবকে প্রণাম।

নারায়ণদেবের প্রণামমন্ত্র

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

শব্দার্থ : নমঃ - প্রণাম বা নমস্কার; ব্রহ্মণ্যদেবায় - ব্রহ্মণ্যদেবকে; গোব্রাহ্মণহিতায় - গো এবং ব্রাহ্মণের মঙ্গলকারীকে; চ - এবং; জগদ্ধিতায় - জগতের হিতকারীকে; কৃষ্ণায় - কৃষ্ণকে; গোবিন্দায় - গোবিন্দকে; নমো নমঃ - নমস্কার, নমস্কার।

সরলার্থ : ব্রহ্মণ্যদেব, গোব্রাহ্মণের এবং জগতের হিতসাধনকারী, কৃষ্ণ ও গোবিন্দকে বারবার নমস্কার করি।

নারায়ণ পূজার গুরুত্ব :

নারায়ণদেব এ জগতের সকল প্রাণীর পালনকর্তা। নারায়ণদেবের কাছ থেকে আমরা সন্তানাদিসহ পৃথিবীর সকল প্রাণীকে দায়িত্বের সঙ্গে পালন করার শিক্ষা পাই। তিনি সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই আমরা ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষসহ সকল প্রানিকুলকে সেবা করে থাকি। নারায়ণদেবের পূজা করলে পূজারির মধ্যে নম্রতাবোধ জাগ্রত হয়। নারায়ণদেবের আশীর্বাদে ভক্তের গৃহে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে, পাপ মোচন হয় এবং সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাই ভক্তরা গৃহের সকল বাধা দূর করার জন্য ভক্তিভরে নারায়ণপূজা করেন এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করেন।

- নারায়ণপূজা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা জোড়ায় আলোচনা করো এবং নিচের ঘরে লেখো।

৪২

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পার্বণ

মঙ্গলকর আচার-আচরণই হলো পার্বণ। পার্বণের সঙ্গে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের যোগ গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুধর্মের সঙ্গে এই পার্বণসমূহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একে ধর্মাচারও বলা যেতে পারে। আবহমানকাল থেকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে উৎসব আনন্দের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পার্বণ পালিত হয়। আমাদের পালিত পার্বণগুলোর মধ্যে নববর্ষ, পৌষ পার্বণ, বিভিন্ন সংক্রান্তি উৎসব, দোলযাত্রা, বসন্তোৎসব, বর্ষা উৎসব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা নববর্ষ ও পৌষসংক্রান্তি সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা চৈত্রসংক্রান্তি ও দোলযাত্রা সম্পর্কে জানব।

পূজা এবং পার্বণের মধ্যে পার্থক্য কী? এসো নিচের ঘরে লিখি।

পূজা	পার্বণ

চৈত্রসংক্রান্তি

বাংলা মাসের শেষ দিনটিকে বলা হয় সংক্রান্তি। সেই ধারাবাহিকতায় চৈত্র মাসের শেষ দিনটিকে বলা হয় চৈত্রসংক্রান্তি। এ দিনটি বাংলা বছরের শেষ দিনও বটে। এ দিনকে ঘিরে থাকে নানা অনুষ্ঠান-উৎসবের আয়োজন। চৈত্রসংক্রান্তি অনুসরণ করেই আসে পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ। শাস্ত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস ও লোকাচার অনুসারে চৈত্রসংক্রান্তির এই দিনে স্নান, দান, ব্রত, উপবাস, নানাবিধ পূজা-পার্বণ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মকে পুণ্যজনক মনে করা হয়। আবহমান বাংলার ঐতিহ্য আর লোকায়ত উৎসবের আমেজ পাওয়া যায় এই দিনটিকে ঘিরে। চৈত্রসংক্রান্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অঞ্চলভেদে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমরা এখন কয়েকটি পার্বণ সম্পর্কে জানব।

চৈত্রসংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানো

নীলপূজা

চৈত্রসংক্রান্তি উদ্‌যাপনে শিব বা নীলপূজার আয়োজন করা হয়। এ দিন ভক্তরা নীলকে সুসজ্জিত করে গীতিবাদ্য সহযোগে বাড়ি বাড়ি পরিভ্রমণ এবং চালডালসহ বিভিন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করেন। নীলের একটি অনুষঙ্গ হলো অষ্টক গান। শিব-দুর্গাকে কেন্দ্র করে এই গান অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যাবেলায় সকলের কল্যাণার্থে ভক্তরা প্রদীপ জ্বালিয়ে নানা উপচার দিয়ে শিবপূজা করেন। এরপর প্রসাদের মাধ্যমে সারাদিনের উপবাস ভঙ্গ করেন। নীলপূজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নীল নাচ এবং শিবের গাজন।

নীলপূজা

চড়কপূজা

লোকউৎসব হিসেবে চড়কপূজা বেশ পরিচিত। চড়কপূজা উপলক্ষ্যে যে আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে তা অনেক এলাকায় গাজন নামে পরিচিত। চৈত্রের দাবদাহ থেকে রক্ষা পেতে বৃষ্টির জন্য চাষিরা পালাগানের আয়োজন করে থাকে। যারা চড়কপূজা উপভোগ করতে আসে তারা কোনো ধর্মের বাঁধনে আবদ্ধ নয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা সময়জুড়েই মেলা চলতে থাকে মহাসমারোহে। চড়কপূজা নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান। কিন্তু একে কেন্দ্র করে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাতে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

চৈত্রসংক্রান্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অঞ্চলভেদে আরও নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চৈত্রসংক্রান্তির দিনে গ্রামবাংলায় খাওয়া হয় ছাতু, দই ও পাকা বেল সহযোগে এক বিশেষ শরবত। এ দিনে নারীরা একটি নির্দিষ্ট খেজুরগাছের গোড়ায় দুধ এবং ডাবের জল ঢেলে পূজা করেন। পূজা শেষে একজন খেজুরগাছ থেকে খেজুর-ভাঙা ভক্তদের মাঝে বিলাতে থাকেন। সেই খেজুর খেয়ে উপোস ভঙ্গ করেন ভক্তরা। একে খেজুর ভাঙা উৎসব বলে।

চড়কপূজা

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বৈসাবি উৎসব

চৈত্রসংক্রান্তি বাঙালি ছাড়াও উদ্‌যাপন করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা। তাদের ভাষায় বৈসাবি পালিত হয় চৈত্রসংক্রান্তি ও নববর্ষের দিনে। বৈসাবি শব্দটির 'বৈ' এসেছে ত্রিপুরাদের 'বৈসু' থেকে, 'সা' এসেছে মারমাদের 'সাংগ্রাই' থেকে, 'বি' শব্দটি এসেছে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের 'বিজু' থেকে। বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সকলের মঙ্গলের জন্য বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

- **আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের পার্বণে অংশগ্রহণ করে থাকি। এবার নিজের ভাষায় এরূপ একটি পার্বণের বর্ণনা লিখি।**

দোলযাত্রা

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবির নিয়ে শ্রীরাধিকা ও অন্যান্য গোপীর সঙ্গে রং খেলেছিলেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস সেখান থেকেই দোল খেলার উৎপত্তি হয়। এই ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সকালে রাধা ও কৃষ্ণের বিগ্রহে আবির রঙে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। একে দোলপূজাও বলা হয়। রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দোলায় চড়িয়ে কীর্তনগান সহকারে শোভাযাত্রা বের করা হয়। এজন্য উৎসবটিকে দোলযাত্রা বলা হয়। এ সময় ভক্তরা আবির খেলে পরস্পরকে রাঙিয়ে দেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমার এই দিনে রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় দুলিয়ে রং খেলা হয় বলেই এ দিনকে দোলপূর্ণিমা বলা হয়। এ পূজার পূর্বরাত শুক্লা চতুর্দশীতে খড়কুটা জ্বালিয়ে অগ্নি-উৎসব করা হয়। একে মেড়া পোড়ানো কিংবা বুড়ির ঘর পোড়ানো বলা হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, বুড়ির ঘর আগুনে পুড়িয়ে অমঙ্গলকে তাড়ানো হয়।

দোলযাত্রায় আবির খেলা

দোলযাত্রা উৎসবের একটি ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন দিকও রয়েছে। এই দিন সকাল থেকেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে আবির ও বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে। একে বসন্ত উৎসবও বলা হয়। কোথাও কোথাও এটি হোলি উৎসব নামে পরিচিত।

দোলযাত্রার গুরুত্ব

দোল উৎসবের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গুরুত্ব অনেক। উৎসবমুখর এই দিনে সবাই অতীতের সমস্ত দোষত্রুটি, ঝগড়া-বিবাদ ভুলে গিয়ে রং খেলায় মেতে ওঠে। পরমতসহিষ্ণুতার বৃদ্ধি ঘটে। একে অপরকে ক্ষমা করে। সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। উৎসবস্থলে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মেলা বসে। গৃহস্থালির অনেক সামগ্রী মেলায় পাওয়া যায়। মেলায় বেচা-কেনার মধ্যেদিয়ে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির একটি সম্ভাবনা থাকে।

- দোলযাত্রায় আমরা কী কী করি তা বর্ণনা করো।

- নিচে মিলকরণটি করো।

নীলপূজা	লোকউৎসব
দোল	চৈত্র মাসের শেষ দিন
চৈত্রসংক্রান্তি	ফাল্গুনী পূর্ণিমা
চড়কপূজা	মারমা
সাংগ্রাই	শিব

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

মন্দিরে দেবতার পুজো করা হয়। এজন্য মন্দিরকে বলা হয় দেবালয়। দেবদেবীর নামানুসারে মন্দিরের নাম হয়ে থাকে। যেমন- কালী মন্দির, দুর্গা মন্দির, শিব মন্দির, আদিনাথ মন্দির, লক্ষ্মী মন্দির, কান্তজী মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির, বিষ্ণু মন্দির ইত্যাদি। আবার স্থানের নাম অনুসারেও মন্দিরের নাম হয়ে থাকে। যেমন- ঢাকেশ্বরী মন্দির, রমনা কালী মন্দির ইত্যাদি। অনেক জায়গায় এসব মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অনেক সাধুসঙ্ঘ। তাঁদের আবাসস্থল। বিভিন্ন আশ্রম। সাধুদের লীলাক্ষেত্র বা বিচরণক্ষেত্রগুলো সবই পুণ্যক্ষেত্র। এই পুণ্যক্ষেত্রগুলো আবার তীর্থক্ষেত্র হিসেবেও পরিচিত। সকল মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রে গেলে মন ভালো হয়। পবিত্রতা বেড়ে যায়। মনে আসে প্রশান্তি। এগুলো আমাদের ঐতিহ্যও বটে। আমরা এখন দুটি মন্দির ও দুটি তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে জানব।

কান্তজী মন্দির

কান্তজী মন্দির বা কান্তজিউ মন্দির বাংলাদেশের দিনাজপুরে ঢেঁপা নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন মন্দির। এটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কান্ত বা কৃষ্ণের মন্দির হিসেবে পরিচিতি। এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মন্দির। বাংলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন রয়েছে এ মন্দিরে। ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন স্থানীয় রাজা প্রাণনাথ রায় মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পালিত সন্তান রাজা রামনাথ রায় ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন।

কান্তজী মন্দির

দীর্ঘ ৪৮ বছর শতাধিক শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই কান্তজী মন্দির। মন্দিরের বাইরে পুরো দেয়াল জুড়ে টেরাকোটার টালিতে রয়েছে রামায়ণ, মহাভারতসহ বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনির চিত্রায়ণ। এ কারণেই কান্তজী মন্দিরটি বাংলার স্থাপত্যশিল্প-বৈশিষ্ট্যে অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণের কাহিনিসমূহকে এখানে জনসাধারণের জীবনের মতো চিত্রায়িত করা হয়েছে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পৌরাণিক ঘটনা। পৌরাণিক কাহিনির লৌকিক উপস্থাপনে তাই কারিগরদের সৃজনশীলতা ও দক্ষতার এক অনন্য নিদর্শন এই কান্তজী মন্দির।

কান্তজী মন্দিরের দেওয়ালের ওপর পোড়ামাটির এ বিশাল অলংকরণ সে সময়ের জীব ও প্রাণশক্তিরই প্রকাশ ঘটেছে। হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের পলিময় মাটিতে লালিত শক্তির ভেতর থেকেই এ শিল্প বেড়ে উঠেছিল।

এখানে রাধা-কৃষ্ণের পূজার পাশাপাশি প্রতি বছর মহাসমারোহে কার্তিক মাসের রাস পূর্ণিমায় রাস উৎসব হয়। ভগবানের আরাধনা ও পুণ্য লাভ করতে ভক্তরা এখানে আসেন। বহু বছর ধরে হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য হিসেবে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ হচ্ছে এই রাসমেলা।

■ নিচের শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করো।

টেরাকোটা শিল্প	
অলংকরণ	
স্থাপত্যশিল্প	
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি	
রাস পূর্ণিমা	

আদিনাথ মন্দির

বাংলাদেশের বিখ্যাত মন্দিরগুলোর মধ্যে আদিনাথ মন্দির অন্যতম। এটি কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত দ্বীপ মহেশখালিতে অবস্থিত। দেবাদিদেব মহাদেবের নামানুসারে এ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে এটি শিব মন্দির নামেও পরিচিত। এ মন্দিরটি মৈনাক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। আদিনাথের অপর নাম মহেশ। মহেশের নামানুকরণে এ জনপদের নামকরণ করা হয় মহেশখালি। অধিকাংশ প্রাচীন মন্দির এবং তীর্থস্থান নিয়ে আছে অনেক পুরাণকথা, লোককথা। যেখানে ইতিহাস পাওয়া যায় না, সেখানে লোককথার ওপর নির্ভর করতে হয়। এখানেও লোককথা থেকে এ মন্দিরটি সম্পর্কে জানা যায়।

আদিনাথ মন্দির

ত্রেতাযুগে লঙ্কার রাজা রাবণ মৈনাক পাহাড়ের ওপর শিবকে স্থাপন করেন। কালক্রমে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় আদিনাথের মন্দির। মৈনাক চূড়ায় এই আদিনাথ মন্দিরের সঙ্গে রয়েছে অষ্টভুজা দেবী দুর্গার মন্দির, ভৈরব মন্দির ও রাধাগোবিন্দ মন্দির। এটি হিন্দুদের একটি অন্যতম তীর্থস্থানও বটে। এখানে প্রতিবছর শিব চতুর্দশী তিথিতে মহাধুমধামে বিশেষভাবে পূজা-অর্চনা হয়। এ সময় স্থানটি দেশি-বিদেশি পুণ্যার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়। সপ্তাহকালব্যাপী মেলা হয়। মূল মন্দিরের পেছনে দুটি পুকুর রয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৮০ ফুট উচ্চতায় হলেও পুকুর দুটি সব সময় জলে পরিপূর্ণ থাকে। ভক্তদের বিশ্বাস, এখানে স্নান করলে রোগ-শোক-পাপ-তাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

আদিনাথ মন্দিরের অন্তর্গত আর কী কী মন্দির আছে?

ওড়াকান্দি

বাংলাদেশে অবস্থিত পুণ্যভূমি বা তীর্থক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ওড়াকান্দি অন্যতম। এটি গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানায় অবস্থিত। হরিচাঁদ ঠাকুরের সাধনভূমি, কর্মভূমি লীলানিকেতন এই ওড়াকান্দি। হরিচাঁদ ঠাকুর বাংলা ১২১৮ সালে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে ওড়াকান্দির পার্শ্ববর্তী গ্রাম সাফলীডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন।

হরিনামে মাতোয়ারা ভক্তবৃন্দ

ছোটোবেলা থেকে হরিচাঁদের মধ্যে অনেক অলৌকিকতা দেখা দেয়। মৃত্যুপথযাত্রী অনেককে তিনি সুস্থ করে তুলেছেন। বহু মানুষের সমস্যার সমাধান করেছেন। তাঁর কাছে মানুষ আসতে থাকে শান্তির জন্য। ধীরে ধীরে তিনি সাধারণ মানুষের ঠাকুর হয়ে ওঠেন। অসংখ্য মানুষ তাঁর অনুসারী হয়।
হরি ঠাকুরের অনুসারীগণ হরিনামে মেতে থাকেন। তাই তারা মতুয়া নামে পরিচিত। মতুয়ামতে কোনো জাতভেদ নেই। ধর্মানুশীলন পদ্ধতিও অতি সহজ। সংসার-কাজে ব্যস্ত থেকেও খুব সহজেই ধর্মানুশীলন করা যায়। হরি, ঠাকুর বলেছেন, 'হাতে কাম মুখে নাম'। যার যে কাজ সেটা করতে হবে আর মুখে হরিনাম বলতে হবে।

ধীরে ধীরে ওড়াকান্দি তীর্থভূমি হয়ে ওঠে। কেবল হিন্দুধর্মানুসারীদের কাছেই নয়, অন্যদের কাছেও এটা তীর্থস্থান। পুণ্য অর্জন ও শান্তিপ্রাপ্তির জন্য সকলে এখানে আসে।

হরি ঠাকুরের জন্মতিথিকে বলা হয় মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী। মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে ওড়াকান্দিতে বিশাল মেলা হয়। তিনদিনব্যাপী এই মেলা হয়। কয়েক লক্ষ লোকের সমাগম হয় এ মেলাতে। দূর-দূরান্ত থেকে মতুয়ারা দলে দলে এই মেলাতে আসে। হরি ঠাকুরের এই মেলাকে বারুণী মেলাও বলা হয়। কারণ এই তিথিতে মহাবারুণী স্নান হয়। এই পুণ্যভূমিতে কামনা পুকুর নামে একটি পুকুর আছে। ভক্তদের এবং তীর্থযাত্রীদের বিশ্বাস, এই পুকুরে স্নান করলে সকল কামনা পূর্ণ হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলন হয় এখানে। মতুয়ারা আসে নিশান ওড়াতে ওড়াতে, জয়ঢাক বাজাতে বাজাতে। 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনিতে মুখরিত হয় চারদিক। প্রখর রৌদ্রের মধ্যে আসতেও পুণ্যার্থীরা ক্লান্তিবোধ করেন না।

- হরিঠাকুরের অনুসারীগণ কী নামে পরিচিত? তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী? নিচের ঘরে লেখো।

লাঙ্গালবন্দ

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অসংখ্য তীর্থস্থানের মধ্যে অন্যতম একটি হলো লাঙ্গালবন্দ। নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদের তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এটি অবস্থিত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এখানে পুণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অসংখ্য পুণ্যার্থী এখানে পুণ্যস্নানের জন্য আসেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই তিথিতে

লাঙ্গালবন্দ পুণ্যস্নান

এখানকার জল স্পর্শ করলে সকল পাপ মোচন হয়। লাঙ্গালবন্দের এ জলধারায় স্নান করে পরশুরাম মুনি পাপমুক্ত হয়েছিলেন। শাস্ত্রোক্ত পরশুরাম মুনির পাপমুক্তির কথা স্মরণ করেই বহু বছর ধরে পুণ্যার্থীরা এই অষ্টমী-পুণ্যস্নান করে আসছেন। মনে করা হয় চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে জগতের সকল পবিত্র স্থানের পুণ্য ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদে স্নানের সময় ফুল, বেলপাতা, ধান, দূর্বা দিয়ে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করা হয়।

আগত ভক্তবৃন্দ যাতে নির্বিঘ্নে পুণ্যস্নান করতে পারেন সেজন্য এখানে অনেক ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। এই বাঁধানো ঘাটগুলোর নামও খুব নান্দনিক। যেমন– অন্নপূর্ণা ঘাট, প্রেমতলা ঘাট, জয়কালী ঘাট, বরদেশ্বরী ঘাট, গান্ধী ঘাট, শংকর ঘাট, কালীদহ ঘাট, শিখরী ঘাট ইত্যাদি। এই ঘাটগুলোর পাশাপাশি এখানে অনেক মন্দির ও আশ্রম গড়ে উঠেছে।

- ব্রহ্মপুত্র নদ হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে কেন তাৎপর্যপূর্ণ তা লেখো।

- নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো কোন মন্দির বা তীর্থক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য হবে?

দিনাজপুর	আদিনাথ মন্দির
রাজা প্রাণনাথ রায়	
মৈনাক	কান্তজী মন্দির
ত্রেতাযুগ	
মতুয়া	লাঙ্গলবন্দ
বারুণী	
অন্নপূর্ণা ঘাট	ওড়াকান্দি
পরশুরাম	

- ধর্ম পালনের জন্য আমরা যে সকল কর্ম করে থাকি সে সম্পর্কে জানলাম। এবার আমরা নিজেরা দলে ভাগ হয়ে ধর্ম পালনের জন্য যে সকল কর্ম করে থাকি তার যে কোনো একটি ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে শ্রেণিতে উপস্থাপন করব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

যোগাসন

কদিন ধরেই শেখরের হাঁটুতে বেশ ব্যথা হচ্ছিল। পড়াশোনায়ও মনঃসংযোগ করতে পারছিল না। এ সময় ষষ্ঠ শ্রেণির যোগাসনের কথা তার মনে পড়ল। পূর্বের মতো করে সে কয়েকবার তা অনুশীলন করার চেষ্টা করল। এর ফলে, সে কিছুটা উপকার পেল। শেখরের ন্যায় এরকম কোনো ঘটনার কথা জানা থাকলে তা শ্রেণিকক্ষে তার বর্ণনা দেই এবং অনুশীলন করে দেখাই।

- এবার দলে বিভক্ত হয়ে যোগাসন শরীর ও মনের কী উপকার করে তার একটি তালিকা করি।

আমরা জানি, বিভিন্ন ধরনের যোগাসন রয়েছে। এগুলোর প্রতিটি বিভিন্নভাবে শরীর ও মনের জন্য উপকারী। পূর্বের শ্রেণিতে আমরা পদ্মাসন ও শবাসনের অনুশীলন পদ্ধতি ও এদেরর উপকারিতা সম্বন্ধে জেনেছি, চলো এবার আরও দুটি যোগাসন সম্বন্ধে জানি এবং দৈনন্দিন জীবনে তা অনুশীলন করি।

যোগাসন

যোগ বলতে বোঝায় মনঃসংযোগ করা। এই মনঃসংযোগ করতে হলে মানুষকে আরামপ্রদ বিশেষ কোনো ভঙ্গিমা বা আসনে বসে নিয়মিত অনুশীলন করতে হয়। যোগ এবং আসন দুয়ে মিলে হয় যোগাসন। নিয়মিত সঠিক পদ্ধতিতে যোগাসন অনুশীলন করলে সুস্থ থাকা যায়। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সতেজ ও কর্মক্ষম থাকে। নীরোগ দেহ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। আমরা নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন করব। বিভিন্ন প্রকার যোগাসন আছে। যেমন—বজ্রাসন, শীর্ষাসন, হলাসন, পদ্মাসন, শবাসন, সিদ্ধাসন, শলভাসন, গোমুখাসন, সর্বাঙ্গাসন ইত্যাদি।

যোগের আটটি অঙ্গ। যথা—

১। যম - যম মানে সংযমী হওয়া।
২। নিয়ম - শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া। নিয়মিত ও পরিমিত স্নান, আহার ও বিশ্রাম করা।
৩। আসন - বিশেষ ভঙ্গিতে বসা বা অবস্থান করা।
৪। প্রাণায়াম - শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিকে প্রাণায়াম বলে।
৫। প্রত্যাহার - মনকে বহির্মুখী হতে না দিয়ে অন্তর্মুখী করাকে প্রত্যাহার বলে।
৬। ধারণা - কোনো এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা।
৭। ধ্যান - কোনো এক বিষয়ে মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা।
৮। সমাধি - ধ্যানস্থ অবস্থায় মনকে বাইরের সমস্ত চিন্তা থেকে দূরে রাখা। ঈশ্বরের চিন্তায় নিজেকে নিমগ্ন রাখা।

আসন যোগের একটি অঙ্গ। স্থির ও সুখাবহ অবস্থিতির নামই আসন। সুতরাং যোগ অভ্যাস করার জন্য যেভাবে শরীরকে রাখলে শরীর স্থির থাকে অথচ কোনো কষ্টের কারণ ঘটে না তাকে যোগাসন বলে।

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা পদ্মাসন ও শবাসন সম্পর্কে জেনেছি। এবার আমরা সিদ্ধাসন ও শলভাসন সম্পর্কে জানব এবং অনুশীলনের চেষ্টা করব।

সিদ্ধাসন:

সিদ্ধাসনরত এই আসনে কোনো ব্যক্তিকে দেখতে অনেকটা ধ্যানস্থ কোনো সাধু বা যোগীর মতো মনে হয়। সিদ্ধপুরুষগণ এই আসন অনুশীলন করেন বলে এই আসনের নাম সিদ্ধাসন।

অনুশীলন পদ্ধতি: সামনের দিকে পা ছড়িয়ে শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে হবে। এবার ডান পা হাঁটু থেকে ভেঙে পায়ের গোড়ালি উরুর সংযোগস্থল তলপেটের নিচে স্পর্শ করে রাখতে হবে। তারপর বাঁ পা হাঁটু ভেঙে ডান পায়ের ওপর রাখতে হবে। দু পায়ের গোড়ালি তলপেটের নিচে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। হাতের তালু ওপর দিকে করে ডানহাতের কবজি ডান হাঁটুর ওপর আর বাঁ হাতের কবজি বাঁ হাঁটুর ওপর রাখতে হবে। দু হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী ছোঁয়াতে হবে। অন্য আঙুলগুলো সোজা থাকবে। তারপর পিঠ, ঘাড় আর মাথা সোজা রেখে চোখ বন্ধ করে দু ভ্রূর মাঝে মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করতে হবে। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। পা বদল করে আসনটি ৫ মিনিট করতে হবে। শেষে শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

সিদ্ধাসন

গুরুত্ব ও প্রভাব:

সিদ্ধাসনে শরীরের যথেষ্ট বিশ্রাম হয়। এই আসনে বসে থাকার ফলে শরীর যেমন বিশ্রাম পায় তেমনি দু পা আড়াআড়ি আর পিঠ সোজা থাকার ফলে মন স্থির থাকে। হাঁটু আর গোড়ালির গাঁট শক্ত হয়ে গেলে এই আসনে উপকার পাওয়া যায়। এই আসনে কটিদেশে আর উদরাঞ্চলে ভালো রক্তসঞ্চালন হয় এবং এর ফলে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ আর পেটের ভিতরকার যন্ত্রগুলো সতেজ ও সবল হয়। কোমর ও হাঁটুর সন্ধিস্থল সবল হয়। এই আসন অভ্যাসে উদরাময়, হৃদরোগ, যক্ষ্মা, ডায়াবেটিস, হাঁপানি প্রভৃতি রোগ দূর হয়। অর্শ রোগে এই আসন অত্যন্ত ফলপ্রদ। সিদ্ধাসনে বসে জপ, প্রাণায়াম ও ধ্যানধারণাদি অভ্যাস করলে সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

- সিদ্ধাসন সম্পর্কে যা জানলাম তার আলোকে নিচের প্রবাহচিত্রটি সম্পন্ন করি। প্রবাহচিত্রের প্রথম ধাপটি করে দেওয়া আছে।

সামনের দিকে পা ছড়িয়ে শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে হবে

শলভাসন

'শলভ' শব্দের অর্থ পতঙ্গ। এই আসন অনুশীলনের সময় শরীরকে পতঙ্গের মতো দেখায় বলে আসনটির নাম শলভাসন।

অনুশীলন পদ্ধতি: আরামদায়ক শক্ত কোনো সমতল জায়গায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। চিবুক মেঝের ওপর

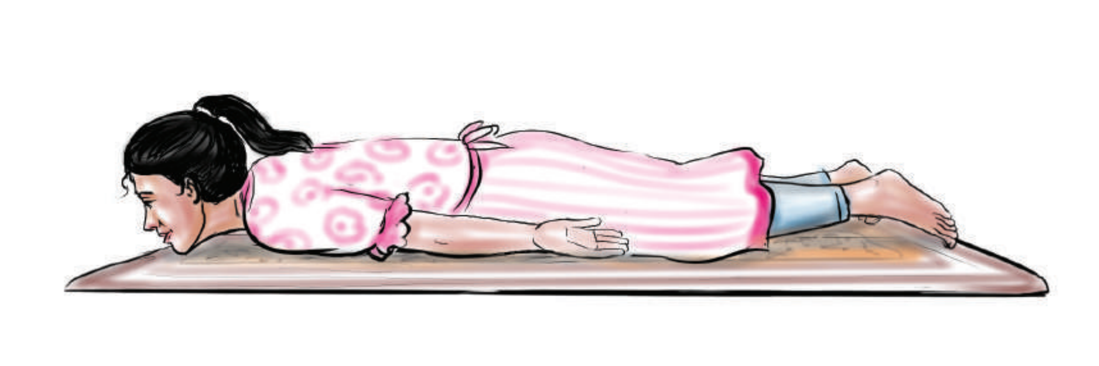

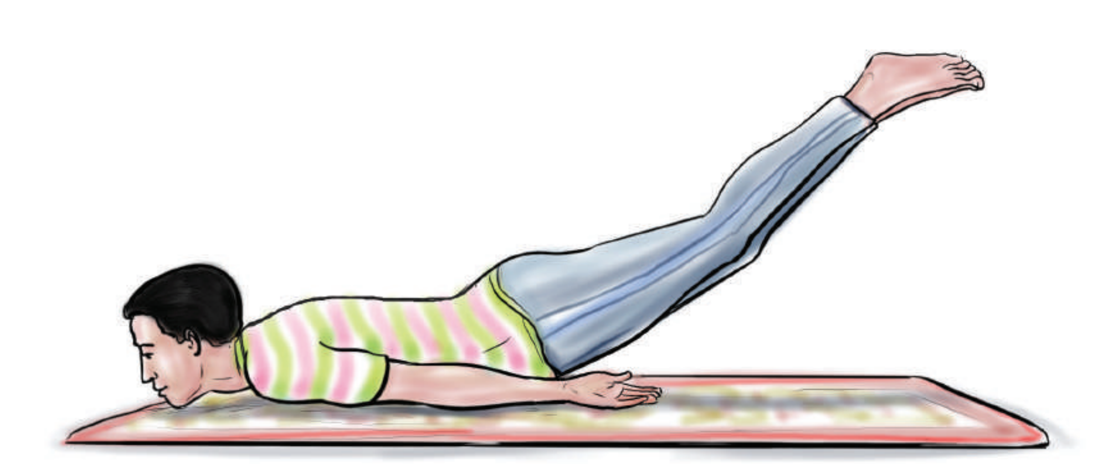

শলভাসন

থাকবে। হাত দুটি সোজাভাবে শরীরের দুপাশে উরুর নিচে এবং হাতের তালু দুটো মাটিতে সমান করে পাতা থাকবে। হাঁটু, উরু ও পায়ের গোড়ালি জোড়া রাখতে হবে। এরপর শ্বাস ধীরে ধীরে গ্রহণের সঙ্গে হাঁটু ভাঁজ না করে উরু ও পা দুটি সোজা রেখে মেঝে থেকে ওপরে তুলতে হবে। এই অবস্থায় ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড থাকতে হবে। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ৫/১০ সেকেন্ড পর শরীর শিথিল করতে করতে পা দুটি নামিয়ে শবাসন করে বিশ্রাম নিতে হবে। আসনটি ৪/৫বার অনুশীলন করতে হবে।

শলভাসনের উপকারিতা:

মেরুদণ্ড ও কোমরের যে কোনো ব্যথায় এই আসন উপকারী। আসনটি মেরুদণ্ডকে নমনীয় ও সবল করে, তলপেট ও পিঠের নিচের অংশের মেদ কমায়। এতে উরু ও কোমরের পেশির গঠন সুন্দর হয়। আসনটি বাত বা সায়টিকার এক আশ্চর্য প্রতিষেধক। এই আসনে গ্যাস্ট্রিক সমস্যা দূর হয়, পেটে বায়ুর প্রকোপ কমে যায়, পেট ফাঁপা সারে, হজম-শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফুসফুস সংলগ্ন স্নায়ুগুলো এবং বায়ুধারণকারী কোষগুলো সুপুষ্ট ও সবল হয়।

■ শলভাসনে যা যা করতে হয় তার একটি প্রবাহচিত্র তৈরি করি। শলভাসন অনুশীলনের ধাপসমূহ বক্স আকারে নিচে ধারাবাহিকভাবে লিখি। প্রবাহচিত্রের প্রথম ধাপটি করে দেওয়া আছে।

আরামদায়ক শক্ত কোনো সমতল জায়গায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে।

সিদ্ধাসন ও শলভাসনের পাঁচটি উপকারী দিক লিখতে হবে।

সিদ্ধাসন	শলভাসন

নৈতিক মূল্যবোধ

- এসো আমরা একটি গল্প লিখি। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা, পরোপকারিতা, প্রভৃতি মানবিক গুণ নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা আছে। আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া এরকম কোনো ঘটনা নিয়ে চলো একটি গল্প লিখি।

- এই যে আমরা ভালো কাজের গল্পগুলো লিখেছি, এখানে অনেক মানবীয় গুণের কথা আছে যার একটি হলো নৈতিকতা। চলো নৈতিকতা নিয়ে হিন্দুধর্মে কী বলা হয়েছে তা জেনে নিই।

নৈতিক মূল্যবোধ

নৈতিকতা

আমাদের চারপাশে ভালো-মন্দ দুটি দিকই আছে। যে কাজ করলে মঙ্গল হয় সেটি ভালো কাজ। আর যে কাজ করলে অমঙ্গল হয় সেটি হচ্ছে মন্দ কাজ। কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা বিচার করার জ্ঞানকে বলে নীতি। নীতির সঙ্গে যা যুক্ত হয় তা-ই নৈতিকতা। নৈতিকতা বলতে বোঝায় ভালো কাজ ও মন্দ কাজের পার্থক্য বুঝতে পারা। নৈতিকতা একটি চারিত্রিক গুণ, একটি মূল্যবোধ। সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, মানবিকতা, সহমর্মিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি, সম্প্রীতি, দেশপ্রেম এ সবই নৈতিকতা। নৈতিকতা ধর্মের অঙ্গ। এখন আমরা সত্যবাদিতা ও ভ্রাতৃপ্রেম সম্পর্কে জানব।

সত্যবাদিতা

উপাখ্যান : সত্যবাদী সত্যকাম

প্রাচীনকালে গৌতম নামে এক ঋষি ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর আশ্রমে শিষ্যদের নিয়ে ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় একটি বালক মাথা নিচু করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। ঋষি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?”

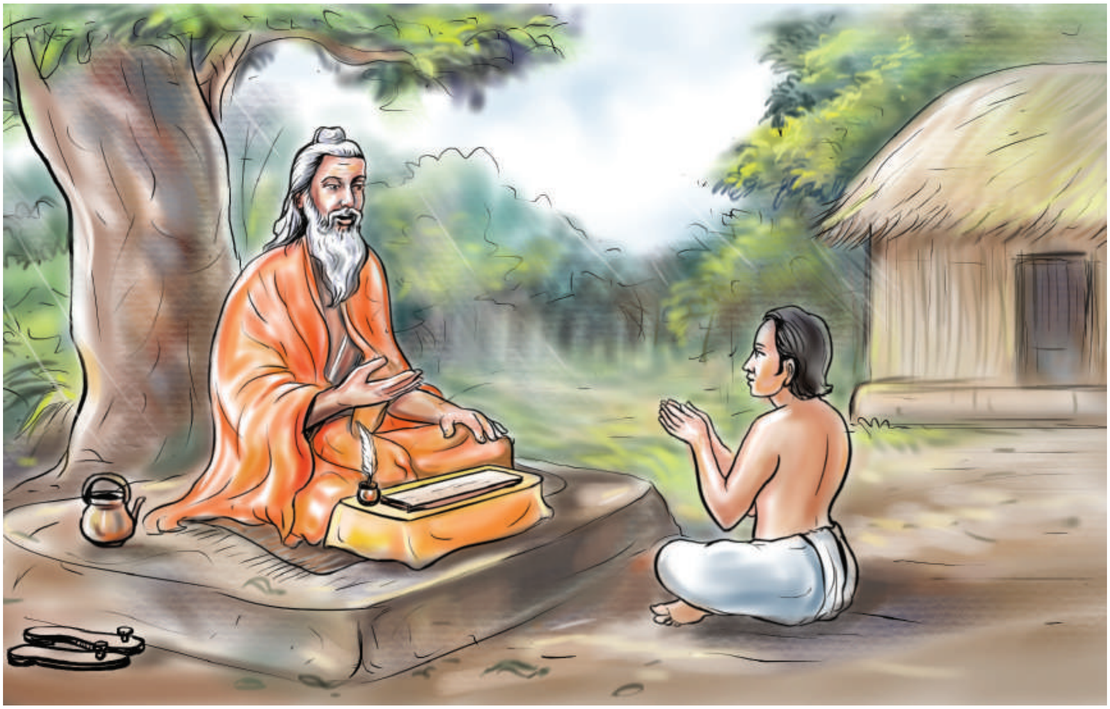

ঋষি গৌতম ও সত্যকাম

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বালকটি হাতজোড় করে প্রণাম করে উত্তর দিল, "আমার নাম সত্যকাম। আমার বাড়ি পাশের গ্রামে। সেখান থেকেই আপনার কৃপালাভ করার জন্য এসেছি।"

ঋষি গৌতম বললেন, এখানে কী চাও? বালকটি বিনীতভাবে উত্তর দিল, গুরুদেব, আমি আপনার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা চর্চা করতে চাই। ধর্মবিষয়ে শিক্ষালাভ করতে চাই।"

তখন ঋষি তার পিতৃপরিচয় জানতে চাইলেন। বালকটি করজোড়ে বলল, "গুরুদেব, আমি আমার পিতা সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না, তবে বাড়িতে আমার মা আছেন। মার কাছ থেকে জেনে আগামীকাল আপনাকে বলব।"

ঘরে এসে সত্যকাম মাকে সব কথা খুলে বলল। তার মা তাকে তার পিতা সম্পর্কে তেমন কিছু না বলে শুধু বললেন, "আমার নাম জবালা। তাই তুমি জাবাল সত্যকাম।" অর্থাৎ সত্যকাম তার মায়ের নামেই পরিচিত হবে।

পরের দিন সত্যকাম ঋষির আশ্রমে গিয়ে গুরুদেবকে বিনয়ের সঙ্গে বলল, "গুরুদেব, আমার মা আমার পিতা সম্পর্কে কিছু বলেননি। মা শুধু বলেছেন, আমি জবালা। তাই তুমি জাবাল সত্যকাম।"

এমন নির্ভীক সত্য কথা শুনে ঋষি সত্যকামকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন,"বৎস, সত্যকাম, তুমি সত্য কথা বলেছ। এমন সত্য কথা সকলে বলতে পারে না। একমাত্র সত্যবাদী এবং সৎসাহসীরাই এমন সত্য কথা বলতে পারে। তোমার এই সত্যবাদিতায় আমি খুশি হয়েছি। আমি তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করব।"

সেদিন থেকে সত্যকাম ঋষি গৌতমের আশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যা চর্চা আরম্ভ করল।

উপাখ্যানের শিক্ষা:

সত্য সর্বদা প্রকাশিত। সত্য প্রকাশ করা উচিত। সত্য কখনো গোপন করা যায় না।

- ধরো আজকে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে একজনের জ্যামিতি বক্স হারিয়ে গেছে। এখন ভয় হচ্ছে যে, বাসায় গিয়ে একথা বললে বাবা-মা হয়তো বকবেন। সেক্ষেত্রে কী করবে? তোমার পরিকল্পনা নিচের বক্সে লেখো।

ভ্রাতৃপ্রেম

স্বার্থহীন ভালোবাসার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ সহোদরদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের শ্রদ্ধা-ভালোবাসাই হলো ভ্রাতৃপ্রেম। আমরা ভ্রাতৃপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাই বাল্মীকি রচিত রামায়ণে রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে। অযোধ্যার রাজা দশরথের ছিল তিন 'রানি'। বড়ো রানি কৌশল্যার পুত্র রামচন্দ্র। মেজোরানি কৈকেয়ীর পুত্র ভরত। এবং ছোটো রানি সুমিত্রার দুই পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। ছোটবেলা থেকেই রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে ছিল খুব ভাব। রাম-লক্ষ্মণ দুটি

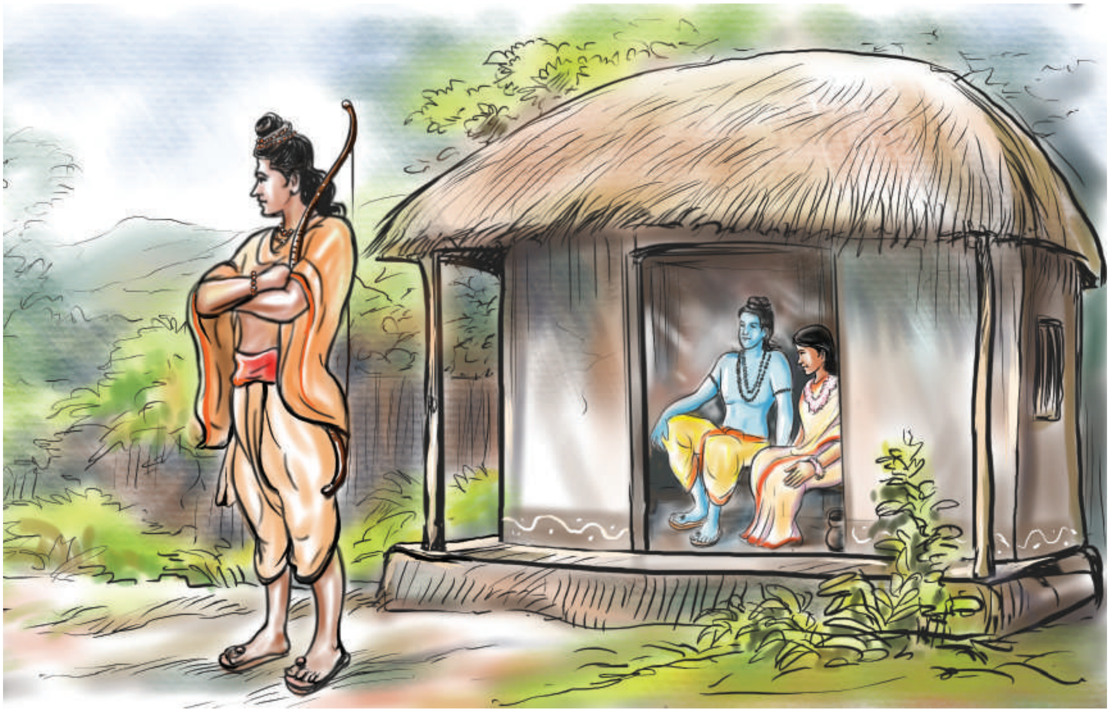

রাম-সীতার সেবায় লক্ষ্মণ

ভাই যেন এক প্রাণ, এক আত্মা। এদের একে অপরের জন্য ছিল গভীর স্নেহ ও ভালোবাসা।
পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়। তখন তাঁর বনবাসের সঙ্গী হন স্ত্রী সীতা। ভাই লক্ষ্মণ তখন তাঁর স্ত্রীকে ছেড়ে দাদার সাথে বনবাসে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। দাদা রামের শত আপত্তি সত্ত্বেও লক্ষ্মণ রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করে দাদার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা থেকেই এ সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিঃসংকোচে নিজের জীবনের চৌদ্দটি বছর ভাইয়ের সেবায় উৎসর্গ করেন। তিনি সর্বদা রামের সঙ্গী ছিলেন। রামচন্দ্রও তাঁর ভাই লক্ষ্মণকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বনবাসে থাকাকালে তিনি একাধারে রামের ভাই ও বন্ধুর ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সর্বক্ষণ দাদার পাশে থেকে তাঁর সেবা করেছেন। বিপদের কোনো আঁচড় দাদার গায়ে লাগতে দেননি।

লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদ বধ ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মেঘনাদ ছিলেন লঙ্কার রাজা রাবণের পুত্র। তিনি ছিলেন মহাপরাক্রমশালী একজন যোদ্ধা। তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করা ছিল একরকম অসম্ভব ব্যাপার। লক্ষ্মণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মেঘনাদকে আক্রমণ করেন। বড়ো ভাই রামকে রক্ষা করার জন্যই তিনি এটা করেছিলেন। মেঘনাদকে লক্ষ্মণ বধ করেন। এতে রামের লঙ্কা জয় সহজ হয়।

লক্ষ্মণের মতো ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এমন দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। আজও মানুষ ভাইয়ে ভাইয়ে সৌহার্দ্য পূর্ণ সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণের উদাহরণ দেয়।

বাস্তব জীবনে আমরা রামায়ণের এই দুই ভাইয়ের চরিত্র থেকে শিক্ষা নিতে পারি। আমরা আমাদের নিজেদের ভাইবোন, সহপাঠী এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সব সময় সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখব । কখনো কারো সাথে ঝগড়া করব না। হিংসা-বিদ্বেষ করব না। আমরা সকলে মিলেমিশে একত্রে বসবাস করব এবং সকলে সকলের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেব। তাহলেই আমাদের জীবন হয়ে উঠবে অনেক সুশৃঙ্খল, সুন্দর ও আনন্দময়।

- নিচের কোন কোন কাজটিতে ভ্রাতৃপ্রেম ঘটেছে বলে মনে করো? উত্তরের ঘরে টিক চিহ্ন দাও।

ঘটনা	ভ্রাতৃপ্রেম	
	হ্যাঁ	না
তুমি তোমার অসুস্থ বন্ধুকে বাড়িতে পৌঁছে দিলে		
তুমি তোমার ছোট ভাই-বোনকে আদর কর		
তুমি তোমার ভাই-বোনের সঙ্গে ঝগড়া করো		
তোমার বন্ধুদের ভালো দেখলে তোমার হিংসা লাগে		
তুমি তোমার সকল বন্ধুর বিপদে তুমি এগিয়ে যাও না		

গুরুভক্তি

অনেক দিন আগের কথা। হস্তিনাপুরে বাস করতেন কর্ণ নামে একজন মহাশক্তিশালী বীর। তিনি দাতাকর্ণ নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন সূর্যদেব ও কুন্তীর পুত্র। তিনি জন্মেছিলেন একটি কবচ ও কুণ্ডল নিয়ে। এই কবচ কুণ্ডলের গুণে তিনি ছিলেন অপরাজেয়। ছোটবেলা থেকেই অস্ত্র ও ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। কর্ণ অস্ত্র শিক্ষার জন্য ভগবান পরশুরামের কাছে যান। পরশুরাম অস্ত্রবিদ্যায় খুব বিখ্যাত ছিলেন।

তিনি কর্ণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। গুরুর প্রতি কর্ণের ছিল গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। তিনি গুরুগৃহে থেকেই অস্ত্র শিক্ষার বিভিন্ন কৌশল অনুশীলন করতে থাকেন। গুরুর প্রতিটি আদেশ তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলতেন। গুরুর নির্দেশে তিনি কঠোর অধ্যবসায় ও নিরলস পরিশ্রম করে অস্ত্র ও ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করেন।

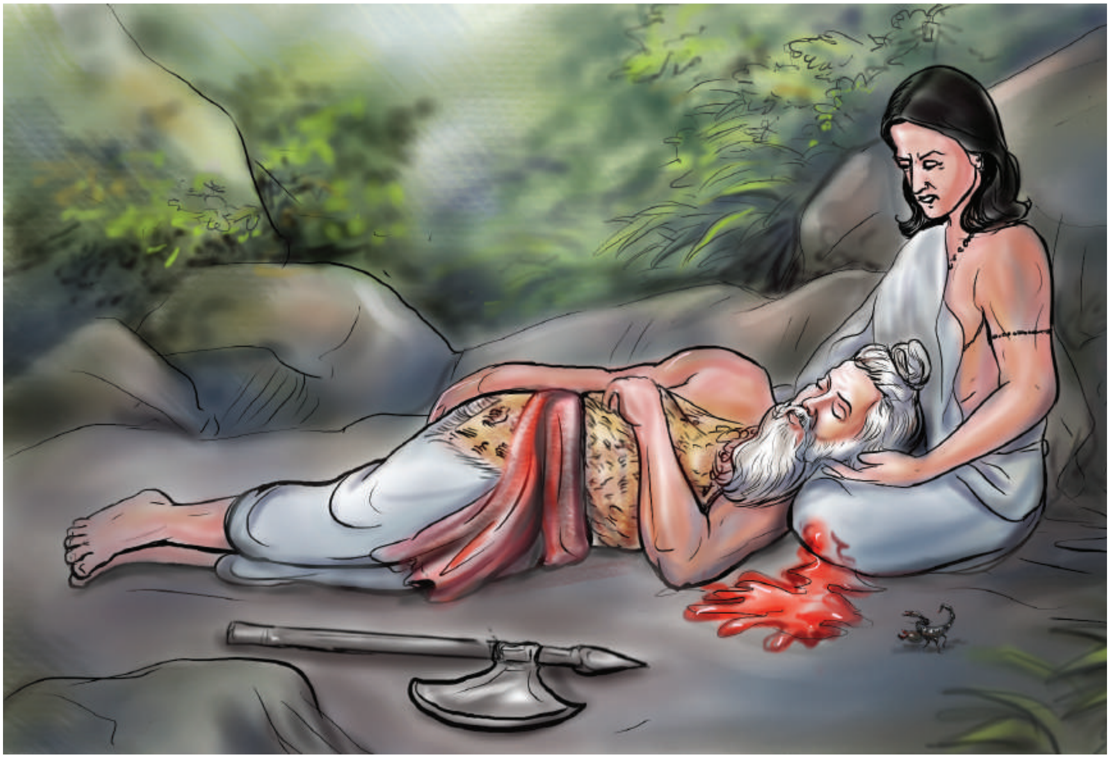

গুরুদেবের সেবারত কর্ণ

এভাবে দীর্ঘ দিন কেটে যায়। একদিন গুরু পরশুরাম তাঁর শিষ্যদের অস্ত্র-শিক্ষা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তিনি একটি প্রস্তরখণ্ডের ওপর বিশ্রাম নেয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান। এমন সময় শিষ্য কর্ণ গুরুদেবকে বলেন, গুরুদেব শক্ত প্রস্তরখণ্ডের ওপর বিশ্রাম নিতে আপনার কষ্ট হবে। দয়া করে আপনি আমার কোলে মাথা রেখে শান্তিতে বিশ্রাম করুন। এ কথা শুনে পরশুরাম বললেন, এতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। এভাবে বিশ্রাম নেয়া আমার অভ্যাস আছে। কিন্তু কর্ণ গুরুকে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করে তাঁকে রাজি করান। পরশুরাম শিষ্যের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। কর্ণ তখন গুরুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। এভাবে অনেকটা সময় কেটে যায়। হঠাৎ একটি বিষাক্ত কীট এসে কর্ণের হাঁটুতে দংশন করে। বিষাক্ত কীটের কামড়ে কর্ণের হাঁটু থেকে দরদর করে রক্ত ঝরতে থাকে। তাঁর পরিধানের কাপড়টি রক্তে ভিজে যায়। প্রচণ্ড কষ্ট পেতে থাকেন তিনি। কিন্তু গুরুদেবের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে তিনি দাঁতমুখ চেপে ব্যথা সহ্য করেন। এতটুকুও নড়াচড়া করেননি। গুরুজনের প্রতি কতটা ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকলে এতটা কষ্ট সহ্য করা যায়!

বিষাক্ত কীটের দংশনের যন্ত্রণা সহ্য করেও তিনি গুরুকে কিছু বুঝতে দেননি। গুরুদেবের ঘুমের বিঘ্ন ঘটুক এটা কর্ণ চাননি। গুরুর প্রতি কর্ণের এই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমাদের কাছে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আমরাও কর্ণের মতো হব। মা, বাবা ও শিক্ষকসহ সকল গুরুজনকে শ্রদ্ধা করব। তাঁদের আদেশ মান্য করব। অর্জন করব গুরুভক্তির মতো নৈতিক গুণ।

- শিক্ষক, বাবা-মা বা গুরুজনের প্রতি ভক্তিমূলক পাঁচটি কাজের কথা লেখো।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

- চলো আমরা একটি মজার কাজ করি। নিচে যে নামগুলো দেওয়া আছে তাদের গুণ সম্পর্কে এই বইয়ে বিস্তারিত লেখা নেই। তাদের কোনো একটি গুণ নিয়ে ব্যাখাসহ নিচে লিখতে হবে ।

রাম	
সীতা	
কর্ণ	
গৌতম ঋষি	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আদর্শ জীবনচরিত

- সমস্বরে নিচের দুই লাইন গাইতে হবে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

- এই দুই লাইনের মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণের বন্দনা করছি। কৃষ্ণকে ভালোবেসে অনেক মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী নিজেদের জীবন মানব কল্যাণে উৎসর্গ করেছেন। এরকম কয়েকজন মহাপুরুষ এবং মহীয়সী নারীর জীবন সম্পর্কে এখন আমরা জানব।

মীরাবাঈ

মীরাবাঈ ছিলেন একজন কৃষ্ণ-সাধিকা। তিনি ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের রাজস্থানের কুড়কী নামক গ্রামে রাঠোর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রত্নসিংহ এবং মাতা বীর কুঁয়রী। মীরা ছিলেন তাঁর পিতামাতার একমাত্র আদরের সন্তান।

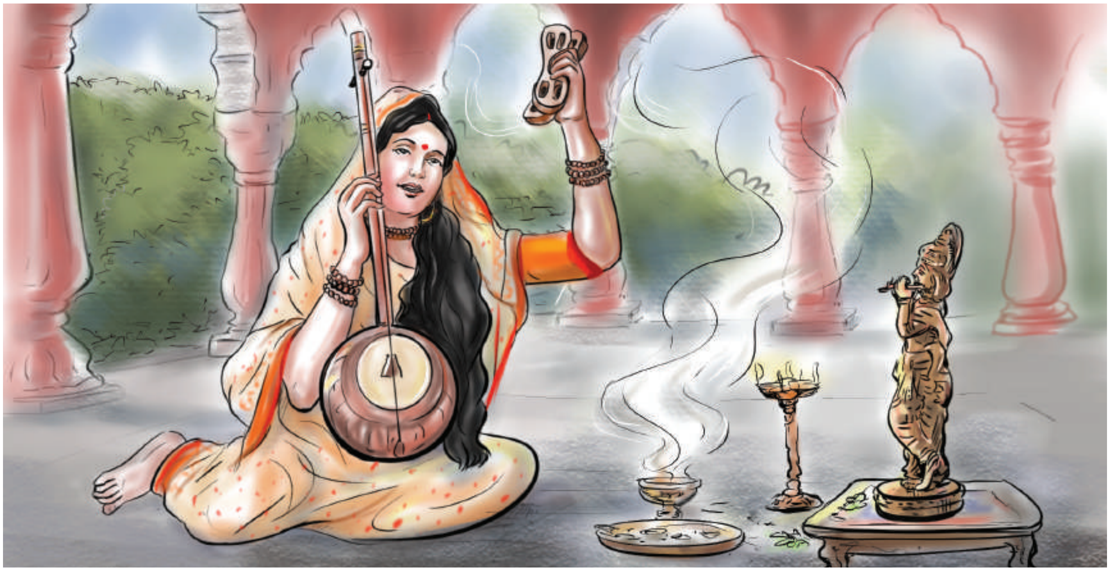

মীরাবাঈ

মাত্র আট বছর বয়সে মীরা তাঁর মাকে হারান। সে সময় মাতৃহারা মীরাকে নিয়ে তাঁর পিতা খুবই বিপদের মধ্যে পড়েন। তখন তাঁর পিতামহ রাও দুধাজী মীরাকে নিজের কাছে নিয়ে যান। পিতামহের রাজপ্রাসাদে মীরার শৈশব কাটতে থাকে। তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। তিনি প্রাসাদের কাছে একটি চতুর্ভুজজীর মন্দির তৈরি করেছিলেন।
সেখানে সাধু-সন্ন্যাসীরা ধর্মীয় আলোচনা করতেন। একবার এক সাধু মীরাকে গিরিধারী গোপালের একটি বিগ্রহ দেন। এই বিগ্রহের সেবা পূজা করেই মীরার সময় কাটত। তিনি প্রিয় গোপালকে নিজের লেখা গান শোনাতেন। ছোটবেলা থেকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

মীরার বয়স তখন আঠারো। ভারতের চিতোরের রাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র ভোজরাজ সিংহের সঙ্গে মীরার বিয়ে হয়। শ্বশুরবাড়িতে তাঁর অসংখ্য দাস-দাসী ছিল। কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু এ রাজবাড়ি ও সংসারের প্রতি তাঁর কোনো আসক্তি ছিল না। তাঁর একমাত্র কাম্য বস্তু ছিল কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণের আরাধনা। মাঝে মাঝেই তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন আপন মনে ভজন সংগীত করতেন। তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে স্বামী ভোজরাজ একটি কৃষ্ণমন্দির নির্মাণ করেন। মীরা খুশি হয়ে কৃষ্ণভজনে দিন অতিবাহিত করেন। মীরার কৃষ্ণপ্রেম এবং সুমধুর কণ্ঠে ভজন সংগীতের কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়। চিতোরের সাধারণ মানুষের কাছে তিনি পরিচিত হয়ে উঠে কৃষ্ণসাধিকা মীরাবাঈ নামে।

■ মীরাবাঈ- এর একটি ভজন সংগীত শুনে লিখি–

রাজ-পরিবারের অনেকেই মীরার এই জীবনযাত্রাকে মেনে নিতে পারেননি। এ অবস্থায় হঠাৎ করে তাঁর স্বামী ভোজরাজ সিংহ মারা যান। তখন চিতোরের নতুন রাণা হন বিক্রমজিৎ সিং। তিনি মীরাকে হত্যা করার জন্য বহুবার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিবারই গিরিধারীর কৃপায় মীরা রক্ষা পান। শেষ পর্যন্ত মীরা তাঁর পিতৃগৃহ মেড়তায়

ফিরে আসেন। কিন্তু এখানেও তাঁর ঠাঁই হয়নি। তাঁর কাকার বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের কারণে মীরা চলে যান বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে এসে মীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তিতে গভীরভাবে আপ্লুত হয়ে পড়েন।

তারপর একদিন তিনি বৃন্দাবনের লীলা সাঙ্গ করে কৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। দ্বারকা ধামে এসে রণছোরজীর বিগ্রহের ভজন-পূজনেই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটান। এই দ্বারকা ধামেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

কৃষ্ণভক্ত মীরাবাঈ ভক্তি ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ভগবানকে পাওয়ার পথ দেখান। তাঁর রচিত ভজন সংগীত এবং ভগবৎ সাধনা এক নতুন পথের সন্ধান দিয়ে গেছে। তাঁর দেখানো এই নতুন পথ হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি করে। এই সম্প্রীতি যে মিলনধারায় প্রকাশ পায় তার নাম 'ভক্তিবাদ'। ভক্তিবাদের মূল উদ্দেশ্য সকল শ্রেণির মানুষকে সমান চোখে দেখা।

মীরাবাঈয়ের বাণী

- মানবজীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু হলো কৃষ্ণপ্রেম আর গিরিধারীলালের সাক্ষাৎ।
- একমাত্র ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ভগবানকে পাওয়া সম্ভব।
- মিথ্যা লোভ বা ছলনায় কখনো বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ো না।
- ভজন সংগীত মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি তৈরি করে।

শিক্ষা: মীরাবাঈয়ের জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যাঁরা প্রকৃত সাধক তাঁরা কখনো মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করেন না। এঁরা জাগতিক সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে যান। সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সম্প্রীতির বাঁধনে বেঁধে রাখেন। দৈহিক জগতের মোহ ত্যাগ করে তাঁরা শুধু একাগ্র চিত্তে সাধনা করেন। আমরাও তাঁদের মতো সর্বদা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করব। কর্তব্য কর্মে কোনো অবহেলা করব না। ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব। জ্ঞানের আলো দিয়ে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করব।

- মীরাবাঈয়ের ৩টি আদর্শ উল্লেখ করো এবং সেগুলোর তাৎপর্য লেখো।

প্রভু নিত্যানন্দ

প্রভু নিত্যানন্দ ১৪৭৩ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হারাই পণ্ডিত এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল কুবের। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার চেয়ে ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল বেশি। তাঁর বয়সি ছেলেরা যখন খেলাধুলায় ব্যস্ত তখন তিনি মন্দিরে গিয়ে বসে থাকতেন। তিনি ছোটোবেলা থেকেই রামায়ণ, মহাভারতের চরিত্রগুলোয় অভিনয় করতেন। সারাক্ষণ কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন থাকতেন। কী করলে শ্রীহরির দর্শন পাওয়া যাবে এটাই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের ভাবনা।

কীর্তনরত প্রভু নিত্যানন্দ ও তাঁর ভক্তবৃন্দ

কুবেরের বয়স তখন বারো বছর। একদিন এক সন্ন্যাসী তাঁদের বাড়িতে এলেন। কুবের তখন সন্ন্যাসীর সঙ্গে বৃন্দাবনে যাওয়ার বায়না ধরেন। কুবের নাছোড়বান্দা, তিনি সন্ন্যাসীর সঙ্গে বৃন্দাবনে যাবেনই। কেননা তিনি জানতেন বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। অবশেষে পিতামাতার সম্মতি মিলল। তিনি সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করলেন। তাঁরা দুজনে একত্রে বহু তীর্থস্থান ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হঠাৎ কুবের একদিন সন্ন্যাসীকে হারিয়ে ফেললেন। এরপর তিনি একাই বিভিন্ন তীর্থস্থান ঘুরে বেড়ান। এভাবে একদিন তিনি উপস্থিত হলেন কাঙ্ক্ষিত বৃন্দাবনে। সেখানে তাঁর দেখা হয় পরম সন্ন্যাসী শ্রীপাদ মানবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে তিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেন। তিনি কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকেন। শ্রীহরির চিন্তায় তাঁর দিন কাটতে থাকে। হঠাৎ একদিন তিনি কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখতে পান। স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নবদ্বীপে যাওয়ার আদেশ দেন। এরপরেই তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে নবদ্বীপের পথে রওনা হলেন। এখানে তাঁর সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা দুজনে মিলে যেন এক হয়ে যান। জীবোদ্ধারের জন্য যেন দুই দেহে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে। সেদিন থেকে কুবেরের নতুন নাম হলো নিত্যানন্দ। সংক্ষেপে নিতাই। আর গৌরাঙ্গের সংক্ষিপ্ত নাম গৌর। ভক্তরা সংক্ষেপে বলতেন গৌরনিতাই। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তাঁরা উভয়ে মিলে হরিনামে মেতে ওঠেন। তাঁরা সকল শ্রেণির মানুষের কাছে বৈষ্ণব মত প্রচার করতে থাকেন। তাঁদের প্রেমধর্মে ছিল না কোনো জাতিভেদ বা উঁচুনিচু

ভেদাভেদ। দীর্ঘকাল শুদ্ধাচরণের নিচে চাপা পড়ে ছিল মানবপ্রেম। গৌরনিতাইয়ের প্রভাবে প্রেমধর্মে প্রেমভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে মানুষ তাঁদের অনুসারী হতে লাগল। নবদ্বীপে তাঁরা নেচেগেয়ে হরিনাম প্রচার করতে লাগলেন। সেই সময় নবদ্বীপে জগাই-মাধাই নামে দুই ভাই নগর কোতোয়ালের কাজ করত। তারা ছিল মদ্যপ ও হরিবিদ্বেষী। যে কোনো অন্যায় কাজ করতে তারা দ্বিধা করত না। গৌরনিতাই প্রেমভক্তি দিয়ে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেন। এদের দুই ভাইয়ের জীবন সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। তারাও তখন নবদ্বীপে কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা হয়ে যায়। এর কিছুদিন পরে শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে চলে যান। প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নির্দেশ মতো গৌড়ে গিয়ে বিদ্বান, মূর্খ, চণ্ডাল, ধনী, দরিদ্র সকলের মধ্যে হরিনাম আর প্রেমধর্ম বিতরণ করতে লাগলেন। তিনি সকলকে এক কৃষ্ণনামে আবদ্ধ করলেন। সার্থক হলো তাঁর প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনামের আন্দোলন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গৌড়বাসীর অন্তরে চির অমর হয়ে থাকেন। ১৫৪২ সালে এই মহাসাধক ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্রভু নিত্যানন্দ কোনো তর্কবিতর্ক ছাড়া সকলের মধ্যে প্রেমভক্তি বিতরণ করেছেন। তিনি কখনোই ধর্ম নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করেননি। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ করেননি। তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজ জীবনে এক বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষ সমস্ত কিছু ভুলে এক কাতারে এসে দাঁড়িয়েছিল। যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর কাছে এসে পরম শান্তি লাভ করত। এমনিভাবে অসংখ্য মানুষ প্রভু নিত্যানন্দের সংস্পর্শে এসে নবজীবন লাভ করে। সার্থক হয় প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনামের আন্দোলন। আমরাও তাঁর মতো সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখব। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ করব না। সকলকে সম্প্রীতির বাঁধনে বেঁধে রাখব।

প্রভু নিত্যানন্দের বাণী

- মানুষে মানুষে কোনো উঁচু-নিচু ভেদাভেদ করবে না।
- একমাত্র প্রেমভক্তি ও মানবপ্রেম দিয়ে মানুষকে আপন করা যায়।
- কাউকে যদি ক্ষমা করো, তাহলে তুমিও ক্ষমা পাবে।
- সকলকে এক কৃষ্ণনামে আবদ্ধ হতে হবে।
- সংসারে সংসারী হয়ে কৃষ্ণনাম নিতে হবে।

- নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখো।

তীর্থস্থান	
সন্ন্যাসী	
কোতোয়াল	
বিদ্বান	
আবির্ভাব	

প্রভু জগদ্বন্ধু

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সামাজিক অবস্থার খুব অবক্ষয় হয়। প্রাচীনপন্থিদের ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি প্রবল হয়ে উঠে। এদের হিংসা-বিদ্বেষ গোটা সমাজজীবনকে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জর্জরিত মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধ ভুলে দিশাহারা হয়ে পড়ে। ঠিক এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ই মে পতিতপাবন প্রভু জগদ্বন্ধুর আবির্ভাব হয়। তাঁর পিতা দীননাথ চক্রবর্তী এবং মাতা বামাদেবী। পণ্ডিত দীননাথ চক্রবর্তী বাস করতেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া গ্রামে। তিনি ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ন্যায়রত্ন উপাধি পেয়েছিলেন। প্রভু জগদ্বন্ধু দেখতে ছিলেন খুব সুন্দর। তাঁর গায়ের রং ছিল কাঁচা সোনার মতো।

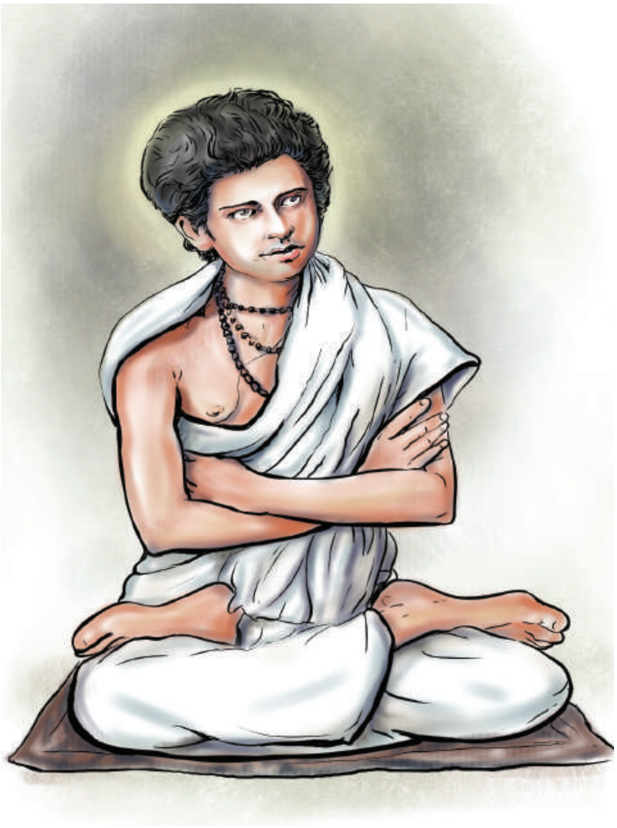

প্রভু জগদ্বন্ধু

জগদ্বন্ধুর বয়স যখন মাত্র চৌদ্দ মাস তখন তাঁর মা মারা যান। দীননাথ তখন এই ছোটো শিশুটিকে নিয়ে গোবিন্দপুর গ্রামে আসেন। তখন জগদ্বন্ধুর লালনপালনের ভার পড়ে তাঁর জেঠতুতো বোন দিগম্বরী দেবীর ওপর। জগদ্বন্ধুর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাঁর বাবাও মারা যান। এর কয়েক মাস পর চক্রবর্তী পরিবার চলে আসে ফরিদপুরের শহরতলী ব্রাহ্মণকান্দায়। জগদ্বন্ধু ফরিদপুর জেলা স্কুলে লেখাপড়া শুরু করলেও শেষ করেন পাবনা জেলা স্কুলে। পাবনা শহরের উপকণ্ঠে ছিল এক প্রাচীন বটগাছ। তার নিচে থাকতেন এক বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ। লোকে তাঁকে ‘ক্ষ্যাপাবাবা’ বলে ডাকত। একদিন তাঁর সঙ্গে জগদ্বন্ধুর সাক্ষাৎ হয়। জগদ্বন্ধুর সঙ্গে তাঁর ভাব জমে যায়। জগদ্বন্ধু তাঁকে ‘বুড়ো শিব’ বলে ডাকতেন। জগদ্বন্ধু অবসর পেলেই সেই বটগাছের নিচে গিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন।

কিছুদিনের মধ্যে শহর ও শহরতলিতে তাঁর এক তরুণ ভক্তদল গড়ে ওঠে। প্রভু জগদ্বন্ধু একদিন ভক্তদের ছেড়ে তীর্থ ভ্রমণে বের হন। তিনি বিভিন্ন তীর্থস্থান ও গ্রামগঞ্জে হরিনাম বিলিয়ে উপস্থিত হন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। সেখানে তাঁর সাধনা চলতে থাকে গভীর থেকে গভীরে। বৃন্দাবনে কিছুকাল থেকে তিনি ফিরে আসেন ফরিদপুরে। ফরিদপুরের উপকণ্ঠে ছিল বুনোবাগদি, সাঁওতাল প্রভৃতি শ্রেণির বাস। তখনকার সমাজপতিদের দৃষ্টিতে তারা ছিল ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য। এদের অনেকেই একটু সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে এবং দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে ধর্মান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক সেই সময় জগদ্বন্ধুর কৃপাদৃষ্টি পড়ে এসব হতদরিদ্র ও অসহায় লোকদের ওপর। তিনি বাগদিদের সর্দার রজনীকে ভালোবেসে বুকে টেনে নেন। রজনী বলেন, ‘আমরা নিচু জাতি। সবাই আমাদের ঘৃণা করে আর তুমি আমাকে বুকে টেনে নিলে!’ প্রভু বললেন, “মানুষের মধ্যে কোনো উঁচু-নিচু ভেদাভেদ নেই। সবাই সমান। সবাই আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

ভগবান মানুষের মধ্যেই আছেন। মানুষের মধ্যে কখনো বর্ণগত ও জাতিগত বৈষম্য হতে পারে না। ছোটো বড়ো ভেদাভেদ শুধু তার গুণ ও কর্মের মাধ্যমে। তোমরা সবাই শ্রীহরির দাস।
আজ থেকে তোমার নাম হরিদাস মোহন্ত।" হরিদাস মোহন্ত অল্পদিনের মধ্যেই প্রভুর কৃপায় প্রসিদ্ধ পদকীর্তনীয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ধীরে ধীরে যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় হরিনাম কীর্তনের এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। প্রভু একদিন ভক্তদের নিয়ে ভ্রমণে বের হয়েছেন। ফরিদপুর শহরের এক জঙ্গালাকীর্ণ জায়গায় এসে তিনি বলেন, "এখানেই আমি শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা করতে চাই।" সেই সময় শ্রীরামকুমার মুদি নামে এক ভক্ত শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেন। প্রভুর নির্দেশেই ১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন। বহু গুণীজন ও ভক্ত অনুরাগীর পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে এ পবিত্র তীর্থভূমি শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন।

এই শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গানেই শুরু হয় প্রভুর গম্ভীরা লীলা। ১৯০২ সাল থেকে শুরু করে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চলে প্রভুর গম্ভীরা লীলা। এ সময় তিনি ছিলেন মৌনী। এর তিন বছর পর ১৯২১ সালে এই শ্রীঅঙ্গানেই প্রভু ইহলীলা সংবরণ করেন।

প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনে দুটি দিক রয়েছে। একটি তাঁর আধ্যাত্মিক দিক। অন্যটি সমাজে পিছিয়ে পড়া অসহায় মানুষের জন্য তাঁর বন্ধুরূপ প্রকাশ। তিনি ছিলেন মানবতার মূর্ত প্রতীক। অসহায় নিষ্পেষিত জীবকে উদ্ধারের জন্য তিনি এবং তাঁর ভক্তরা সর্বত্র হরিনাম কীর্তন প্রচার করেন। প্রভুর আগমন বার্তা এবং হরিনাম কীর্তনের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে মহানাম সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায় গঠনে শ্রীপাদমহেন্দ্রজী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মহানাম সম্প্রদায় মানবতার পাঁচটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যথা : (১) চুরি না করা (২) হিংসা না করা (৩) সত্যবাদী হওয়া (৪) আত্মসংযমী হওয়া এবং (৫) অন্তরে ও বাহিরে শুচি বা পবিত্র থাকা।
প্রভু জগদ্বন্ধু শ্রীশ্রী হরিকথা, ত্রিকাল, চন্দ্রপাত গ্রন্থসহ বহু কীর্তন রচনা করেছেন।

প্রভু জগদ্বন্ধুর কয়েকটি বাণী

- ভ্রষ্টবুদ্ধি হয়ে মাতা-পিতার মনে কষ্ট দিতে নেই।
- যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করলেও শান্তি পায় না।
- কেউ মূর্খ থাকিও না। মূর্খ আমার কথা বুঝিতে পারিবে না। অজ্ঞানের হরিভক্তি হয় না।
- পরচর্চা কর্ণে বা অন্তরে স্থান দিও না। পরচর্চা, পরনিন্দা ত্যাগ করো। ঘরের দেয়ালে লিখে রেখো, পরচর্চা নিষেধ।
- জীবদেহে নিত্যানন্দের বসবাস। কোনো জীবকে আঘাত করলে নিত্যানন্দকে আঘাত করা হয়।

শিক্ষা : প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, সব মানুষ সমান, কেউ উঁচু-নিচু নয়। কোনো মানুষই ঘৃণ্য বা অস্পৃশ্য নয়। তিনি তাঁর প্রেমভক্তি দিয়ে ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষকে মানব ধর্মে দীক্ষিত করেন। আমরাও তাঁর মতো সকল মানুষকে ভালোবাসব। কারো মনে আঘাত দিব না। কারণ মানুষকে আঘাত দিলে সে আঘাত নিত্যানন্দকে বা ভগবানকে দেয়া হয়। পিতামাতা হচ্ছেন পরম গুরু। তাঁদেরকে কষ্ট দিব না। তিনি শিক্ষা গ্রহণের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই আমরাও জগদ্বন্ধুর কথা মেনে মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করব। কাজের মধ্যে সর্বদা হরিনাম করব। পরচর্চা ও পরনিন্দা করব না। এই শিক্ষাগুলো আমরাও আমাদের জীবনে মেনে চলব।

- এসো আমরা নিচের মিলকরণটি করি।

বুনো বাগদি	দীননাথ চক্রবর্তী
ক্ষ্যাপাবাবা	মোহন্ত
মানবসেবক সংঘ	ফরিদপুর
শ্রীঅঞ্জান	মহানাম সম্প্রদায়
ন্যায়রত্ন	বুড়োশিব

- প্রভু জগদ্বন্ধুর যে পাঁচটি মূলনীতি আছে তার আলোকে তুমি কী করতে পার লেখো।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

স্বামী স্বরূপানন্দ

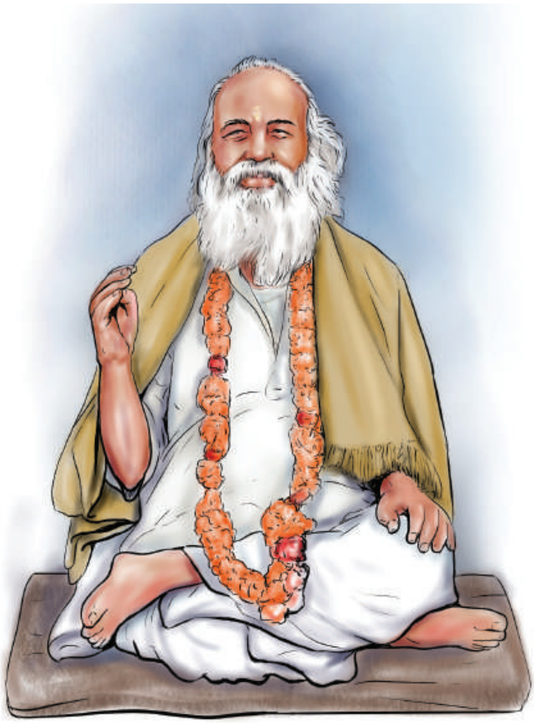

স্বামী স্বরূপানন্দ

স্বামী স্বরূপানন্দ একজন প্রখ্যাত সাধক এবং সমাজ সংস্কারক। তাঁর জন্মস্থান বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলা সদরের পুরাতন আদালত পাড়া। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে তাঁর জন্ম। প্রতি খ্রিস্টাব্দের শেষ মঙ্গলবার তাঁর জন্মদিন পালিত হয়। তাঁর পিতা সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং মাতা মমতা দেবী। প্রথমে তাঁর নাম ছিল বঙ্কিম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নাম হয় স্বরূপানন্দ। বহু গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। ছোটো বেলা হতেই তাঁর এই গুণের অনেক প্রকাশ দেখা যায়। এর মধ্যে ধ্যানমগ্নতা একটি। ছোটোবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিল বল্টু । বল্টু সহপাঠীদেরকে ঈশ্বরীয় ভাবনার প্রেরণা দিত। মানবিক গুণের বিকাশেও উদ্বুদ্ধ করত। সুন্দর চরিত্রের জন্য সঙ্গীদের নিকট শৈশব হতেই তিনি প্রিয় ছিলেন। একবার সঙ্গীরা বল্টুর কাছে একটা নতুন খেলার আবদার করে। বল্টু সকলকে একসঙ্গে ধ্যান করতে বসাল। তারপর নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী ভগবানের নাম জপ করতে বলল। সকলেই নাম জপ শুরু করল। কিছুক্ষণ পরেই একে একে সবাই বাড়ি চলে গেল। এদিকে বল্টুর ধ্যান আর শেষ হয় না। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেল। বল্টু বাড়ি ফিরল না। বাড়ির লোকেরা বল্টুর খোঁজে এসে দেখে সে গভীর ধ্যানে মগ্ন। ধ্যান ভাঙিয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো। এই ধ্যান ও নামজপের চর্চা বল্টুর জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। সুযোগ পেলেই বল্টু এটা করত। অন্যদিকে ছোটোবেলা থেকেই তার চোখে পড়ল সমাজের কুসংস্কার। দেখলেন মানবিক অবক্ষয়, বর্ণভেদ ইত্যাদি। এ অবস্থা দূরীকরণে তিনি সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। একদিকে আধ্যাত্মিতা, অন্যদিকে সমাজ সংস্কার। এ দুটো তাঁর সারা জীবনের ব্রত হয়েছিল।

সকল মানুষের জীবনে পরিবারের একটা প্রভাব থাকে। স্বরূপানন্দের ঠাকুরদাদার নাম ছিল হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়। সর্বমহলে তিনি সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজহিতে নিজেকে উৎসর্গ করা একজন যোগীপুরুষ। পিতা ছিলেন স্বভাবকবি। দেশের মুক্তি আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। পিতা এবং পিতামহের সকল গুণের বিকাশ পরিলক্ষিত হয় স্বামী স্বরূপানন্দের জীবনে। দেশে তখন ব্রিটিশ বিরোধী মুক্তি আন্দোলন চলছে। নিজে রাজনীতিমুক্ত জীবন-যাপন করেছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবীগণের প্রেরণার উৎস। স্বামী স্বরূপানন্দ জোর দিয়েছেন মানুষের চরিত্র গঠনের ওপর। তিনি বলতেন- ‘‘মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার চরিত্রে।” তিনি চরিত্রগঠন নিয়ে অনেক ভেবেছেন। দেশের কিশোর এবং যুবকদের নির্মলচেতা হতে এবং শুভবুদ্ধি জাগাতে তিনি “চরিত্রগঠন আন্দোলন” কর্মসূচি ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি শুরু করেন স্বাবলম্বন কর্মসূচি। তিনি চাঁদপুর শহরের নিকটবর্তী ঘোড়ামারার মাঠে ১৯১৪ সালে চরিত্রগঠন আন্দোলনের সূচনা করেন।

অন্যদিকে তিনি ছিলেন হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিক সাধনার উৎস ও মহাসমন্বয় এক ওঙ্কার সাধনার আজন্ম সাধক। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "ওঙ্কার সর্ব মন্ত্রের প্রাণ, সর্ব মন্ত্রের সমন্বয় এবং সর্ব তত্ত্বের স্বীকৃতি।" তাঁর একটি বড়ো কৃতিত্ব একসঙ্গে সকলের জন্য ভগবানের আরাধনার সমান সুযোগ করে দেওয়া। সকল শ্রেণির জন্য তিনি সমবেত প্রার্থনার প্রবর্তন করেন। এই সমবেত উপাসনায় ভক্তগণ সমকালে, সমমন্ত্রে, সমাসনে বসে এক ভগবানের আরাধনা করে থাকেন। সমবেত উপাসনায় বর্ণভেদ বা ছোটো-বড়ো শ্রেণিবৈষম্য থাকে না। বিশেষ পুরোহিতেরও প্রয়োজন নেই, নেই উপাসনালয়। এ সমবেত প্রার্থনায় সকলে মিলে এক হয়। সকলে মিলে সবার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা হয়। বিশ্বের মঙ্গল কামনা করা হয়। তিনি জানতেন, স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে কোনো কাজে সফল হওয়া যায় না। তাই তিনি সুস্বাস্থ্য গঠনে যৌগিক আসন-মুদ্রার ব্যাপক প্রচার করেছেন। সামাজিক সুস্থতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রচার করেছেন তিনি। নৈতিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে তিনি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় অজস্র ভাষণ প্রদান করেছেন। লোককল্যাণে তিনি সকলকে স্বাবলম্বণ করার ব্রত নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, ভিক্ষাবৃত্তি সম্মানহানিকর। ভিক্ষুকের কোনো মর্যাদা নেই। পরহিতে তিনি ত্যাগের অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কৃষির প্রসারে তিনি আধুনিক কৃষি-শিক্ষার কথা বলেছেন। অগণিত ফলদবৃক্ষ, সবজির চারা, কৃষিবীজ বিতরণ করেছেন তিনি। দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যার উন্নয়নে তিনি আয়ুর্বেদ ঔষধ তৈরির বিশাল প্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। ভালো মানুষ গড়ার একান্ত লক্ষ্য ছিল তাঁর। তিনি পরনির্ভরতামুক্ত আদর্শ চরিত্রের মানুষ সৃষ্টির শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রদান করেছিলেন। বন-পাহাড়ের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনের মানোন্নয়নে তিনি সুবিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তিনি জনসেবার অনুশীলনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ১৯৮৪ সনের ২১ শে এপ্রিল স্বামী স্বরূপানন্দ কলকাতায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

স্বরূপানন্দের জীবনী থেকে আমরা নানামুখী শিক্ষা পাই। আমরা পাই যথার্থ মানুষ গড়া এবং জনকল্যাণমূলক কাজের প্রেরণা। যথার্থ মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন চরিত্রগঠন ও নৈতিক শিক্ষা। জনকল্যাণমূলক কাজে চাই স্বাবলম্বী হওয়া, কৃষির উন্নয়ন। সুস্থ সমাজগঠনে প্রয়োজন অসাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টি ও জাতিভেদ ও বর্ণভেদ দূরীকরণ। স্বরূপানন্দের আদর্শ প্রচার ও প্রসারে নির্মিত হয়েছে 'অযাচক আশ্রম'। তাঁর অনুসারীরা 'অখন্ডমন্ডলী' নামে পরিচিত। অনুসারীদের কাছে তিনি 'অখন্ডমন্ডলেশ্বর'। আধ্যাত্মিক সাধনায় স্বরূপানন্দ সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু সবার উপরে তিনি জনসেবাকে স্থান দিয়েছেন।

স্বামী স্বরূপানন্দের কয়েকটি বাণী :

- একের মাঝে সবাই আছে, তাই ত একের উপাসনা।
- কর্মই ব্রহ্ম।
- অভিক্ষাই নবযুগের সাধনা।
- স্বাবলম্বনই শক্তিমানের পরিচয়পত্র।
- মনুষ্য জন্মের সার্থকতা ভগবানে ভালোবাসা।
- নিখিল বিশ্বকে আপন করিবার সাধনার নাম হিন্দুধর্ম।
- জাতিবৈর নির্মূল হোক।
- উদারতাই মনুষ্যত্বের ভিত্তিভূমি।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পাবনা জেলার হেমায়েতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ১২৯৫ সালের ৩০শে ভাদ্র (ইংরেজি ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর) শুক্রবার শুভ তালনবমী তিথিতে শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর ঘরে মাতা মনোমোহিনী দেবীর কোলে জন্ম নেন। শুভদিনে মাতা মনোমোহিনী দেবী নিজ পুত্রের নাম রাখেন অনুকূলচন্দ্র। অনুকূলচন্দ্রের পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আর মাতা মনোমোহিনী দেবী ছিলেন অত্যন্ত ইষ্টপ্রাণ একজন নারী।

পাবনার হেমায়েতপুরই অনুকূলচন্দ্রের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়। পাঁচ বছর বয়সে ভগবান শিরোমণি আর সূর্য শাস্ত্রীর নিকট বালক অনুকূলচন্দ্রের হাতেখড়ি সম্পন্ন হয়। প্রথমে কাশীপুর-হাটতলায় কেষ্ট বৈরাগীর পাঠশালায় তিনি পাঠ গ্রহণ শুরু করেন। পরে তিনি পাবনা ইনটিস্টিউশনে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপরে তিনি পড়াশোনা করেন পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে। এ বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য মনোনীত হন। পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতিও নেন। এর মধ্যে তিনি জানতে পারেন, তাঁরই এক সহপাঠী টাকার অভাবে পরীক্ষার ফি দিতে পারছে না। এগিয়ে এলেন অনুকূল। নিজের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি দিয়ে দিলেন বন্ধুকে। সেবার আর তাঁর পরীক্ষা দেয়া হলো না। অনুকূল পাশ করলেন পরের বছর। মায়ের ইচ্ছায় এরপর তিনি ভর্তি হলেন কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে। এখানে তিনি স্থানীয় কুলিমজুরদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

চিকিৎসা বিদ্যা শেষ করে তিনি গ্রামে ফিরে আসেন। এসেই তিনি গ্রামের গরিব-দুঃখী মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, মানুষের দুঃখ দূর করতে হলে শুধু শারীরিক চিকিৎসা নয়, মানসিক ও আত্মিক চিকিৎসারও প্রয়োজন আছে। এভাবে সারাজীবন তিনি গরিব-দুঃখী মানুষের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই অনুকূলচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত মাতৃভক্ত। মাতৃ-আজ্ঞা পালনে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। তিনি তাঁর বাণীতে বলেছেন, ''মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলেই হয় কৃতী তত।”

পিতার প্রতিও ছিল তাঁর সমান শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধ। একবার পিতার অসুখের সময় সংসারে খুব অভাব-অনটন দেখা দিল। বালক অনুকূলচন্দ্র তখন নিঃশঙ্কচিত্তে সংসারের হাল ধরেছেন। তিনি তখন প্রতিদিন আড়াই মাইল পথ পায়ে হেঁটে শহরে গিয়ে মুড়ি বিক্রি করতেন। আর উপার্জিত অর্থ দিয়ে বাবার জন্য ঔষধ-পথ্য ও সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এনে মায়ের হাতে তুলে দিতেন। এভাবে তিনি পিতামাতাকে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে নিরন্তর ভালোবেসেছেন। তিনি বলেছেন, “পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান, সেই ছেলে হয় সাম্যপ্রাণ।”

অনুকূলচন্দ্র ছিলেন সমাজের অসহায় অবহেলিতদের বন্ধু। তাদের নিয়ে তিনি কীর্তন দল গঠন করেন। কীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের মানসিক শান্তির বিধান করেন। অনেক শিক্ষিত তরুণও এগিয়ে আসেন। তাঁর এই কীর্তন এক সময় একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। সবাই তাঁকে তখন ডাক্তার না বলে ‘ঠাকুর’ বলে ডাকত। সেই থেকে তিনি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র নামে পরিচিত হন। তাঁর খ্যাতি ক্রমশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সৎসঙ্গ আশ্রম, পাবনা

মানুষ যাতে সৎ পথে থাকে, সৎ চিন্তা করে সেজন্য ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণের জন্য পাবনার হেমায়েতপুর গড়ে তোলেন সৎসঙ্গ আশ্রম। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্তয়নী ও সদাচার- এই পাঁচটি সৎসঙ্গের মূলনীতি।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে অনুকূলচন্দ্র বিহারের দেওঘরে যান এবং সেখানে একটি আদর্শ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিষ্যসম্প্রদায় এবং সৎসঙ্গের কর্মকাণ্ড উভয় বাংলার নানা অঞ্চলে আজও সক্রিয়। ঢাকা, পাবনা, সিলেট, টাঙ্গাইল ও চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সৎসঙ্গ আশ্রম ও মন্দির এর মাধ্যমে জনগণকে নানারকম সেবা দেওয়া হয়। অনুকুল ঠাকুরের উদ্যোগে বহু প্রতিষ্ঠান এবং তার শাখা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন তপোবন বিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়, বিশ্ব কল্যাণ কেন্দ্র, মাতৃ সদন, সৎসঙ্গ কৃষি ব্যাংক, দাতব্য চিকিৎসালয়, সৎসঙ্গ প্রেস ইত্যাদি। এ সকল প্রতিষ্ঠান দক্ষ-শিক্ষিত-স্বাবলম্বী জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

'সত্যানুসরণ' গ্রন্থটি ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের স্বহস্তে লিখিত। এ ছাড়া তাঁর বাণীসম্বলিত পুণ্য-পুথিঁ, পথের কড়ি, অনুশ্রূতি, চলার সাথী, নারীর নীতিসহ বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
প্রতি বছর ৩০শে ভাদ্র অসংখ্য ভক্তের মিলনে ঠাকুরের পুণ্য জন্মভুমি হেমায়েতপুরে পবিত্র গঙ্গা স্নান উৎসব পালিত হয়। তিনি ১৯৬৯ সালের ২৭শে জানুয়ারি ৮১ বছর বয়সে অমৃতলোকে গমন করেন।

শিক্ষা বিষয়ে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কিছু অমিয় বাণী হলো:-

১. অভ্যাস, ব্যবহার ভাল যত
শিক্ষাও তা'র জানিস্ তত।

২. মুখে জানে ব্যবহারে নাই
সেই শিক্ষার মুখে ছাই।

৩. শুধু পড়াতেই হয় নাকো পাঠ
হাতে কলমে করা চাই
হাতে কলমে করবে যত
সত্ত্বায়ও ফুটবে তেমনি তাই।

৪. সাধু সেজ না, সাধু হও।

৫. অন্যে বাঁচায় নিজে বাঁচে,
ধর্ম বলে জানিস তাকে।

শিক্ষা: ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষা ছিল মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই। যে যে-সম্প্রদায়েরই হোক না কেন মনে রাখতে হবে ঈশ্বর এক, ধর্ম এক। সংসারে থাকবে, মন রাখবে ভগবানে। শুধু লেখাপড়া করলেই বড়ো হওয়া যায় না, আচার-ব্যবহার জানতে হয়। শিষ্টাচার, সততা, সময়ানুবর্তিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সদাচার প্রভৃতি নৈতিকমূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হতে হবে। সব সময় মানবসেবামূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে হবে। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এইসব শিক্ষা স্মরণ রেখে আমরা পথ চলব এবং জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

- আদর্শ মহামানবদের কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তুমি যদি কোনো মানবকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চাও সেটার বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তা নিচে লেখো।

সম্প্রীতি

- চলো আমরা একটা মজার কাজ করি। প্রথমেই চলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মাদার তেরেসা'র প্রতিকৃতি দেখি।
- এই যে প্রতিকৃতি দেখলে, এখন পরের তিনটি প্যানেলে/ঘরে নিজের কল্পনা থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে তোমাদের কমিক্স আঁকতে হবে। প্রতি ঘরে একটি করে দৃশ্যের কথা বলা আছে যার ওপর ভিত্তি করে ছবিটি আঁকবে।

এখানে নিচের বিষয়ের উপরে ছবি অঙ্কন করো:
মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন

এখানে নিচের বিষয়ের উপরে ছবি অঙ্কন করো:
দরিদ্রদের সাহায্য করা

এখানে নিচের বিষয়ের উপরে ছবি অঙ্কন করো:
বর্ণপরিচয় বই প্রণয়ন ও প্রকাশ

■ একইভাবে মাদার তেরেসাকে নিয়েও ছবি/কার্টুন আঁকো।

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো:

১. দরিদ্র এলাকায় শিশু বিদ্যালয় পরিচালনা

২. অনাথ আশ্রম পরিচালনা

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো ১. হাসপাতালে অসুস্থ মানুষদের সেবাকাজ ২. মিশনারিজ অব চ্যারিটি স্থাপন
এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো ১. শিশুদের জন্য খাবার পরিবেশন ২. এইডস, কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা রোগীদের সেবা

- এই যে তোমরা দুজন বরেণ্য ব্যক্তির ভালো ভালো কাজের ছবি আঁকলে, এখানে দেখো তাঁদের মানবসেবামূলক কাজগুলো ফুটে উঠেছে। তাঁরা সকলের মঙ্গলার্থে কাজ করে গিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা সমাজের সকল মানুষের প্রতি সম্প্রীতির একটি বন্ধন দেখিয়েছেন। হিন্দুধর্মেও সম্প্রীতির জন্য এরকম বহু মহামানব কাজ করে গিয়েছেন। তাহলে আজ চলো আমরা সম্প্রীতি নিয়ে আমাদের ধর্মের মনীষীদের চিন্তাগুলো জানি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মাদার তেরেসা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করেছেন। সমাজের সকল মানুষের জন্য তারা কাজ করেছেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সম্প্রীতি

আমাদের শ্রেণিতে অনেক ধর্ম-বর্ণের বন্ধুরা আছে। আমরা সবাই মিলেমিশে এক সঙ্গে থাকি, পড়াশোনা করি, আনন্দ করি। একে অন্যের সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করি। এই যে, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকা, একে অপরের সুখ-দুঃখ অনুভব করা, এটাই হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ বা সম্প্রীতি। সমাজজীবনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে হলে সমাজের সব সম্প্রদায় ও ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়।

বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক চেতনার অন্যতম লীলাভূমি। যুগ যুগ ধরে এ দেশের ইতিহাসে ধর্মীয় সম্প্রীতির কথা লেখা আছে। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে ভিন্নতা থাকলেও বাংলার হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ। প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক কোনো যুগেই এই সহাবস্থানের বন্ধন ছিঁড়ে যায়নি।

সকল ধর্মের মূল মন্ত্র হচ্ছে শান্তি। কোনো ধর্মই অন্যায়কে সমর্থন করে না। সনাতন ধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্মের বিধিবিধান ও আচার-অনুষ্ঠান মানবকল্যাণে এবং মানুষকে সত্য-সুন্দর ও সুখশান্তির দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। তাই বিশ্বব্যাপী আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে হলে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি একান্ত প্রয়োজন।

সনাতন ধর্মে শান্তি-সৌহার্দ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষায় রয়েছে শাশ্বত আদর্শ ও সুমহান ঐতিহ্য। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরল দৃষ্টান্ত রয়েছে সনাতন ধর্মে। এখানে বলা আছে– সকল জীবেই ঈশ্বর বিরাজমান। ঈশ্বর সকলকে আশীর্বাদ করেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “যে যেভাবে সৃষ্টিকর্তাকে অর্থাৎ আমাকে ভজনা করে আমি সেভাবেই তাকে অনুগ্রহ করে থাকি।”

আমাদের ধর্মে একটি অতি সুন্দর শান্তির বাণী আছে –

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া:,
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিদ্ দুঃখ ভবেৎ।।
ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

অর্থাৎ জগতের সবাই যেন সুখী হয়, সকলে আরোগ্য লাভ করুক, সবাই অপরের মঙ্গলার্থে কাজ করুক, কখনো যেন কেউ দুঃখ ভোগ না করেন। সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক।

এ জগতের সকল প্রাণীর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। সনাতন বা হিন্দুধর্ম বিশেষ কোনো প্রাণী বা ধর্মের লোকের জন্য প্রার্থনা করে না। বিশ্বের সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মের কল্যাণই হিন্দুধর্মের একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য।

শ্রী চৈতন্যদেব বলেছেন, “জীবে প্রেমের মাধ্যমেই আসল অভীষ্ট পূর্ণ হয়। সকলের প্রতি ভালোবাসা প্রদান না করলে কখনো আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না। মানুষে মানুষে তুচ্ছ ভেদাভেদ দূর করতে হবে। এই জগতে মানুষ ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব-সে কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।”

যা মানবতা বিরোধী তাই পরিত্যাজ্য
মানবের সাধনা হোক মনুষ্যত্ব লাভ।
সনাতন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামন্ত্র।
শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

চণ্ডীদাস বলেছেন, “সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই।”

অথর্ববেদের উনবিংশ কাণ্ডে বলা হয়েছে,
“দেবমাতা অদিতি কর্মের সাথে আমাদের শান্তি প্রদান করুক। অন্তরীক্ষ আমাদের হিত সাধন করুক। বায়ু আমাদের শান্তি দিক। বৃষ্টিপ্রদ পর্জনদেব আমাদের কল্যাণ করুক। বাগদেবী সরস্বতী স্থিতির সাথে আমাদের শান্তি প্রদান করুক।”

অথর্ববেদে দেবমাতা অদিতি, বায়ু, সরস্বতী দেবী সকলের কাছে জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা হয়। অর্থাৎ, সনাতন ধর্মে শুধু হিন্দু সম্প্রদায় নয়, বিশ্বের সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করা হয়।

এবার আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মাদার তেরেসা সম্পর্কে জানব।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক।

শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজ : বিদ্যাসাগর শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক বহু কাজ করেছেন। বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। তাঁকে বলা হয় নারীশিক্ষা প্রসারের পথিকৃৎ। তাঁর উদ্যোগে ভারতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। তিনি শুধু নারীশিক্ষার উদ্যোগই নেননি, সকল শ্রেণির মানুষের শিক্ষার জন্যও তিনি নিবেদিত প্রান ছিলেন, সকলের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৮৫৩ সালে বীরসিংহ গ্রামে সবার জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায়ও সকল মানুষের শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য তিনি কাজ করেন। তিনি স্কুল-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি ভারতবর্ষে বিধবা-বিবাহ ও নারীশিক্ষার প্রচলন করেন। তিনিই প্রথম বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রথা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্র, আর্ত ও পীড়িতের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলা গদ্যের জনক। তিনি বাংলা লিপি সংস্কার করেন এবং যুগান্তকারী শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয়সহ একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। নারীমুক্তি আন্দোলনের তিনি ছিলেন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। পত্রিকা প্রকাশে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজের ধনী-দরিদ্র, শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য কাজ করে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে গিয়েছেন।
পুরস্কার ও অভিধা : জনহিতকর কর্মের জন্য তিনি ‘দয়ার সাগর’ এবং পাণ্ডিত্যের জন্য ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি লাভ করেন।

মৃত্যু : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

- বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তোমার পছন্দের জনহিতকর, সমাজ সংস্কার বা কল্যাণমূলক যে কাজগুলো করা যায় তার একটি তালিকা করো।

মাদার তেরেসা

জন্ম: মাদার তেরেসা ১৯১০ সালের ২৬শে আগস্ট, অটোমান সাম্রাজ্যের আলবেনিয়া রাজ্যের স্কপিয়তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরিবার ছিল আলবেনিয়ান বংশোদ্ভূত।

আহ্বান: ১২ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের কাজের জন্য আহ্বান পেয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁকে খ্রিষ্টের কাজ করার জন্য একজন ধর্মপ্রচারক হতে হবে। ১৮ বছর বয়সে তিনি পিতা-মাতাকে ছেড়ে আয়ারল্যান্ডে ও পরে ১৯২৯ সালে ভারতে আইরিশ নান সম্প্রদায়ের "সিস্টার্স অব লরেটো" সংস্থায় যোগদান করেন। ডাবলিনে কয়েক মাস প্রশিক্ষণের পর তাঁকে ভারতে পাঠানো হয়। তিনি ভারতে ১৯৩১ সনের ২৪ শে মে সন্ন্যাসিনী হিসেবে প্রথম শপথ গ্রহণ করেন। পরে ১৯৩৭ সালের ১৪ ই মে চূড়ান্ত শপথ গ্রহণ করেন।

সেবামূলক কাজ: তিনি কলকাতার বস্তিতে দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করেন। যদিও তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। তিনি বস্তির জন্য একটি উন্মুক্ত স্কুল শুরু করেছিলেন। ১৯৫০ সালের ৭ ই অক্টোবর তেরেসা "ডায়োসিসান ধর্মপ্রচারকদের সংঘ" করার জন্য ভ্যাটিকানের অনুমতি লাভ করেন। এ সমাবেশই পরবর্তী সময়ে "দ্য মিশনারিজ অব চ্যারিটি" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। "দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটি" হল একটি খ্রিষ্ট ধর্মপ্রচারণা সংঘ ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫০ সালে তিনি "নির্মল শিশু ভবন" স্থাপন করেন। এই ভবন ছিল এতিম ও বসতিহীন শিশুদের জন্য এক ধরনের স্বর্গ। ২০১২ সালে এই সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৪,৫০০ জনেরও বেশি সন্ন্যাসিনী। প্রথমে ভারতে ও পরে সমগ্র বিশ্বে তাঁর এই ধর্মপ্রচারণা কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত চ্যারিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দরিদ্রদের মধ্যে কার্যকর সহায়তা প্রদান করে থাকে। যেমন- বন্যা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নেশা, গৃহহীন, পারিবারিক পরামর্শদান, অনাথ আশ্রম, স্কুল, মোবাইল ক্লিনিক ও উদ্বাস্তুদের সহায়তা ইত্যাদি। তিনি ১৯৬০ এর দশকে ভারত জুড়ে এতিমখানা, ধর্মশালা এবং কুষ্ঠরোগীদের আবাসস্থল নির্মাণ করেছিলেন। তিনি অবিবাহিত মেয়েদের জন্য তাঁর নিজের ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তিনি এইডস আক্রান্তদের যত্ন নেয়ার জন্য একটি বিশেষ বাড়িও তৈরি করেছিলেন। মাদার তেরেসার কাজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সময় বিশ্বের ১২৩টি দেশে মৃত্যু পথযাত্রী এইডস, কুষ্ঠ ও যক্ষারোগীদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র, ভোজনশালা, শিশু ও পরিবার পরামর্শ কেন্দ্র, অনাথ আশ্রম ও বিদ্যালয়সহ দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ৬১০টি কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল।

পুরস্কার: মাদার তেরেসা ১৯৬২ সালে ফিলিপাইন সরকারের কাছ থেকে "ম্যাগসেসে শান্তি পুরস্কার" এবং ১৯৬৯ সালে "জওহরলাল নেহেরু পুরস্কার" লাভ করেন। তিনি ১৯৭৮ সনে "বালজান পুরস্কার" লাভ করেন। মাদার তেরেসা ১৯৭৯ সনে দুঃখী মানবতার সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ "নোবেল শান্তি পুরস্কার" অর্জন করেন। ১৯৮০ সালে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান "ভারতরত্ন" লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে "প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম পুরস্কার" লাভ করেন। ২০১৬ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে একটি অনুষ্ঠানে পোপ ফ্রান্সিস তাকে 'সন্ত' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং ক্যাথলিক মিশনে তিনি 'কোলকাতার সন্ত তেরিসা' নামে আখ্যায়িত হন।

মৃত্যু: তিনি ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখ ৮৭ বছর বয়সে কোলকাতার পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন।

- শ্রেণিকক্ষে সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা আলোচনা করো। এটা দলে বা জোড়ায় করতে পার।

- বিদ্যাসাগর এবং মাদার তেরেসার যে কাজগুলো তোমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে তা লিখে নিয়ে আসবে।

মেট্রোরেল (নির্মাণাধীন)

"বাঁচবে সময়, বাঁচবে পরিবেশ
যানজট কমাবে মেট্রোরেল"

এই রূপকল্পকে সামনে নিয়ে তৈরি হচ্ছে দেশের প্রথম এলিভেটেড মেট্রোরেল সিস্টেম। এই মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার এবং তা দুইদিক থেকে ঘণ্টায় প্রায় ৬০,০০০ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। মেট্রোরেলের মাধ্যমে উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত দ্রুত পৌঁছানো যাবে এবং তা যানজট নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও এবং পরবর্তীতে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু হয়েছে। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রোরেলের কাজ চলমান আছে। এছাড়া আরও পাঁচটি রুটে মেট্রোরেল নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
৭ম শ্রেণি
হিন্দুধর্ম শিক্ষা

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ

- শ্রী রামকৃষ্ণ

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হবে

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **‘৩৩৩’** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য